কিতাবুত তাহ্‌রীদ্‌
(৬)
মুস'আব ইলদিরিম

কিতাবুত্‌ তাহ্‌রীদ্‌ ‘আলাল্‌ ক্বিতাল
পর্ব ৬:
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
হতে
দাবানল
মুস্‌’আব ইলদিরিম

কিতাবুত্ তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল

ষষ্ঠ ও সর্বশেষ পর্ব

অগ্নিস্ফূলিঙ্গ হতে দাবানল

মুস'আব ইলদিরিম

(مصعب البرق)

উৎসর্গ:

হযরত মুআয ইবনে আমর ও মুআয ইবনে আফরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উত্তরসূরী হিন্দুস্তানের সকল মুসলিম কিশোর ও যুবকদেরকে, বিশেষত বাংলাদেশের সেই সকল জেন-যী (Gen-Z) সিংহশাবকদের প্রতি, যারা খালি হাতে তাগুতের বন্দুকের সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে জীবন উৎসর্গ করে এক মহাকাব্যিক নির্ভীকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, পতন ঘটিয়েছে যামানার এক মুরতাদ লেডি ফেরাউনের। তোমাদের হাতেই সূচনা হোক দিল্লীর লালকেল্লা বিজয়ের সূচনার প্রথম পর্ব.........

ভূমিকা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده- أما بعد

আমার প্রাণপ্রিয় ভাই!

একটি সুদীর্ঘ সময় পরে হলেও আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতে আপনাদের সামনে "কিতাবুত্ তাহরীদ্ 'আলাল্ ক্বিতাল্" এর ষষ্ঠ পর্ব "অগ্নিস্ফূলিঙ্গ হতে দাবানল" কিতাবটি নিয়ে হাজির হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। এর মধ্যে যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর তা রব্বে কারীমের তরফ হতে। আমরা তো কেবল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই ইবাদত করি, একমাত্র তাঁকেই ভয় করি, তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই সামনে সিজদাবনত হই।

প্রিয় ভাই! মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর ইচ্ছায় আজ দিকে দিকে জিহাদী জাগরণ দৃশ্যমান। সন্দেহ নেই বিশ্বব্যাপী "খিলাফাহ্ 'আলা মিনহাজিন্নুবুয়্যাহ" (Global Caliphate) এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীর বুকে এই খিলাফাহ্ কায়েম করবে কে? এই দায়িত্ব কার? কারা সেই গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিবে? হ্যাঁ ভাই, এটি আমাদের সকলের উপর ফরযে আইন একটি দায়িত্ব। এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। সেই মোবারক কাফেলায় আমাদেরকে যুক্ত হওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যারা শেষ যামানায় বাতিলের গর্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে, বিশেষতঃ আমাদের হিন্দুস্তানে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করবে। সেই সাথে আমাদের কিশোর ও তরুণ প্রজন্মকে (জেন যী) জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবতা ও ফলপ্রসূতা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য আমাদের নিজেদেরই প্রস্তুতি কোথায়? কোথায় আমাদের ব্যস্ততা? হায়! আমরা এখনো ঘুমন্ত! আহ্বানকারীদের আহ্বান যেন নিষ্ফল, দাঈদের দাওয়াত যেন আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বারবার ফিরে আসে, আমাদের তালাবদ্ধ অন্তরে যেন তা প্রবেশ করে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।.........

যাই হোক, আমাদের এহেন পরিস্থিতির কারণসমূহ এবং তা হতে উত্তরণের নানাবিধ পন্থা নিয়ে পূর্বের পর্বগুলোতে আলোচনা গত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। এই পর্বে আমরা আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় ভাই! জিহাদ নিয়ে আমাদের গাফলতির অন্যতম একটি কারণ হল মুমিন হিসেবে আমাদের যে আত্মমর্যাদাবোধ বা গাইরত থাকার কথা ছিল তা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা হারিয়ে ফেলেছি মুসলিম হিসেবে আমাদের জাত্যাভিমান, হারিয়েছি আমাদের সোনালি অতীতকে। শৌর্য-বীর্যের সেই অতীতের সাথে আমাদের নাড়ির যেন একরকম ছেদ ঘটেছে। ফলে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের পিতৃপরিচয়। আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদের আত্মপরিচয়। আমরা জানিনা কী ছিল আমাদের অতীত ইতিহাস! ফলে যে ইসলাম একসময় দিগ্বিজয়ী সিপাহসালার জন্ম দিয়েছে, সে ইসলাম আজ আমাদের কাছে অপরিচিত। তাই সময় এসেছে উম্মাহকে তার আসল পরিচয় স্মরণ

করিয়ে দেয়ার। তার মানসপটে সেই চিন্তাধারার বিকাশ ঘটানোর যা পূর্বপুরুষদের সাথে তার আত্মিক মিলবন্ধন তৈরি করবে, সৃষ্টি করবে এক নিশ্ছেদ্য নাড়ির বন্ধন, ছিন্ন করবে মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খল, বান্দার গোলামী হতে আজাদ হয়ে ছুটে যাবে রবের গোলামীর দিকে, কাপুরুষতার যিন্দেগী হতে বেরিয়ে রচনা করবে বীরত্বের মহাকাব্যমালা।...................

অবশেষে বলতে চাই, আমি একজন সাধারণ মানুষ মাত্র, অবশ্যই ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নই। আলোচ্য কিতাবটিতে কারো নজরে কোনো ভুল ত্রুটি ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে, মেহেরবানী করে তা আমাকে অবহিত করবেন; ইনশাআল্লাহ্, আমি আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান আহসানাল জাযা।

পরম করুণাময় যেন আমাদের সকলকে “জিহাদ ও শাহাদাত ফী সাবীলিল্লাহ”র জন্য কবুল ও মঞ্জুর করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

-মুস‘আব ইলদিরিম

১২ রজব, ১৪৪৬ হিজরি

(১২ জানুয়ারী, ২০২৪ ঈসায়ী)

সূচিপত্র

আমরা কাদের উত্তরসূরী? কী আমাদের পিতৃপরিচয়?

প্রিয় ভাই! আমরা কাদের সন্তান? আমরা কাদের উত্তরসূরী? কী আমাদের পিতৃপরিচয়? কী আমাদের রূহানী বংশপরিচয়?..

একজন মানুষের জন্য এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও পরিতাপের বিষয় যে, সে তার পিতৃপরিচয় ভুলে যায়। আপন পিতৃপরিচয় ভুলে গেলে মানুষের অবস্থা কী হয়, তা নিয়ে চলুন আপনাদের একটি কল্পকাহিনী শুনাই।

পিতৃপরিচয় হারানো রাজকুমার:

কোন এক সময় কোনো এক রাজ্যের রাজার দুইজন জমজ ছেলে সন্তান ছিল। দুইজনের চেহারা প্রায় কাছাকাছি। হঠাৎ করে দুই জনের একজন রাজকুমার ছোট বেলায় হারিয়ে গেলেন। অনেক খোঁজাখুজির পরও তাকে আর পাওয়া যায়নি। ঐ দেশেরই শহরের কোনো এক বস্তির নিঃসন্তান কিন্তু হৃদয়বান ব্যক্তি ঐ ছেলেটিকে পেয়ে বস্তিতেই তাকে লালন পালন করতে লাগল। লোকটি জানতো না যে সে যাকে পেয়েছে সে ঐ রাজ্যের রাজকুমার। আর তাই রাজকুমারকে সে বস্তিতেই বড় করতে লাগল। এভাবে সেই হারানো রাজকুমার বস্তিতেই তার শৈশব, কৈশোর আর যৌবন পার করে দিলেন। আস্তে আস্তে তার কাছে বস্তির জীবনই স্বাভাবিক হয়ে উঠল। বস্তির নোংরা পরিবেশ, বস্তির কুঁড়েঘরগুলোই এখন তার সবচেয়ে আপন। বস্তির আর দশটা বখাটে ছেলেই তার বন্ধু। তার যখন বিয়ের বয়স হল, তখন বস্তিরই আরেকটি সাধারণ ঘরের মেয়ের সাথে তার বিয়ে হল। সকাল বেলা তিনি রিযিকের সন্ধানে বেরিয়ে যান। কুলিগিরি কিংবা মজদুরি করেই তার সংসার অতিবাহিত হচ্ছে। যখন তার সন্তান-সন্ততি হল তারাও সেই বস্তির পরিবেশেই বড় হতে লাগল। এভাবেই এক অসীম গদ্যময়তার মাঝে তার জীবন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আর এটিই হচ্ছে পিতৃ পরিচয় হারিয়ে ফেলা সেই রাজকুমারের জীবন কাহিনী।

প্রিয় ভাই! দৃশ্যপটটি একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করি।

অন্যদিকে, হারিয়ে যাওয়া রাজকুমারের আরেক ভাই পিতার তত্ত্বাবধানেই বড় ও যোগ্য হয়ে বেড়ে উঠেছেন। তার পিতার মৃত্যুর পর যোগ্যতা বিচার করে দেশের বিজ্ঞ আলেমসমাজ ও বিশিষ্টজনেরা তাকেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গ্রহণ করেছেন ও তার হাতে বাইয়াত নিয়েছেন। তিনি এখন দেশের সিংহাসনে বসেছেন, রাজপ্রাসাদে বসে রাজত্ব পরিচালনা করছেন। তার চারপাশে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গরা অবস্থান করছে। তার যখন বিয়ের বয়স হল তখন পাশের রাজ্যের আরেক রাজার কন্যার সাথে তার বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে। তারা তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে বেশ আরাম আয়েশে আর মহা দাপটে দিনাতিপাত করছেন। তিনি তার সন্তান সন্ততিকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য যত রকম শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন তাই দিচ্ছেন। তিনি তার রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য এক মহা শক্তিধর সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছেন। আরো রাজ্য জয়ের চিন্তায় তিনি সবসময় অস্থির হয়ে থাকেন। আশেপাশের কয়েকটি রাজ্যে আক্রমন করে তিনি ইতিমধ্যে জয়ও করে ফেলেছেন। চারদিকে কেবল তার জয়-জয়কার। একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তার সুনাম ও সুখ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। তার পিতার আমলে রাজ্যের একটি অংশ পাশের

দেশের অন্য একজন জালেম শাসক দখল করে নিয়েছিল। কিছুকাল আগে তিনি ঐ অঞ্চলে হামলা করে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে তার পৈত্রিক রাজত্ব উদ্ধার করে ফেলেছেন। এভাবে তিনি তার রাজ্যের একজন অতি জনপ্রিয় রাজায় পরিণত হয়েছেন।.........................

গল্পটির শিক্ষা:

প্রিয় ভাই! যদিও এটি একটি কাল্পনিক গল্প, কিন্তু বাস্তবতা এমনই হয়ে থাকে। আপন পিতৃপরিচয় ভুলে গেলে রাজার ছেলের যিন্দেগীও বস্তির নগণ্য একজন কুলি/মজুরের মতই হয়ে যায়। উপরের গল্পটিতে যে দুটি ভাইয়ের কাহিনী বলা হল, তাদের জীবন কি একই রকম? তাদের ইজ্জত-সম্মান কি একই স্তরের? তাদের উভয়কেই কি দেশের জনগণ কিংবা পৃথিবীবাসী একই চোখে দেখে? উভয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি কি একই রকম? উভয়কেই কি মানুষ একই রকমভাবে ভয় কিংবা শ্রদ্ধা করে? এককথায়, এই দুই ভাই কি কখনো সমান হতে পারে?..............

না ভাই, কখনোই এরা সমান হতে পারে না।

বর্তমান বিশ্বে আমরা মুসলিম জাতি সেই পিতৃপরিচয় হারিয়ে যাওয়া বস্তির রাজকুমারের যিন্দেগী যাপন করছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন একেকজন মহা বীর, আর আমরা হলাম কাপুরুষ। তারা ছিলেন কর্মঠ, পরিশ্রমী আর আমরা হলাম অলস, বাচাল। তারা জিহাদ করে পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন কায়েম করেছেন, একেকজন অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন, আর আমরা জিহাদ করবো তো দূরে থাক, জিহাদের নাম শুনলেই মূর্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মত হয়ে যাই। যেই সময়ে আমার আপনার দিগ্বিজয়ী সিপাহসালার (সেনাপতি) হওয়ার কথা ছিল, রাজ্যজয়ের নেশায় যখন নির্ঘুম থাকার কথা ছিল, সারা পৃথিবী জয় করে যেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার কথা ছিলো, সেই সময়ে আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছি, ছোট্ট একটি চাকুরি কিংবা ব্যবসার পিছনে সারাটা জীবন অতিবাহিত করে ফেলছি। যখন আমাদের ঘরগুলো উচ্চ বংশীয়া, সুন্দরী দাসী-বাঁদী রমনীতে ভরপুর থাকার কথা ছিল, তখন আমরা দুয়েকটি হারাম রিলেশনের পিছনে পড়ে যিন্দেগী বরবাদ করে দিচ্ছি। যখন যুদ্ধাস্ত্রই আমাদের অহংকার ও গৌরবের বস্তু হওয়ার কথা ছিল, তখন আমরা অস্ত্রের নাম শুনলেই ভয় পাই, অস্ত্র থাকাটা 'হিকমাহ'র পরিপন্থী মনে করছি। যে 'সামরিক জীবন' হওয়ার কথা ছিল আমাদের প্রথম কাম্য, আমাদের প্রথম পছন্দ, আমাদের ইজ্জতের বিষয়, সে সামরিক জীবনকে আমরা অপছন্দ করছি।

হায়! আমরা যদি আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম!.............

প্রিয় ভাই! চলুন, ইতিহাসের পাতা থেকে দেখে আসি, আমরা কাদের উত্তরপুরুষ! তাহলেই আমরা এই বাস্তবতা কিছুটা হলেও বুঝতে সক্ষম হব যে, আমরা একেকজন মুসলমান একেকজন পিতৃপরিচয় ভুলে যাওয়া রাজকুমার।

আমাদের নবী ছিলেন যোদ্ধা নবী, রাষ্ট্রনায়ক নবী:

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (০৯ সূরা তাওবা:৩৩)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন,

بُعِثْتُ بالسيفِ بينَ يدَي الساعةِ حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا شريكَ له

"কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে তরবারি সহকারে পাঠানো হয়েছে, যাতে করে এই যমীনে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়, যার কোনো শরীক নেই।" (মুসনাদে আহমাদ-৫১১৪)

وَأَنَا الْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ الْمَلاحِمِ

"আমি একত্রকারী, আমি যুদ্ধের নবী (নাবিয়্যুল মালাহিম)"

(শামায়েলে তিরমিযি, হাদিস নং-২৮৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৪৯২; শারহুস্ সুন্নাহ, হা/৩৬৩১; মুস্তাদ্রাকে হাকেম, হা/৪১৮৫; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হা/৩২৩৫১; মুস্নাদুত তায়ালুসী, হা/৪৯৪)

جعل رزقي تحت ظل رمحي

"আমার রিযিক বর্শার ছায়াতলে রাখা হয়েছে।" (বুখারী শরীফ-১/৪০৮)

প্রিয় ভাই! আল্লাহর রাসূলের ﷺ দশ বছরের মাদানী যিন্দেগীর দিকে তাকাই। যেসকল যুদ্ধে/অভিযানে তিনি সশরীরে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেগুলোকে আমরা 'গাযওয়া' বলি, আর এমন গাযওয়ার সংখ্যা ছিল সাতাশটি। আর যেসকল যুদ্ধে তিনি পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, অর্থাৎ নিজে না গিয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়ে অন্য কোনো সাহাবীকে নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন সেগুলোকে আমরা 'সারিয়্যা' বলি। এরূপ সারিয়্যার সংখ্যা ছেচল্লিশটি। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের ﷺ মাদানী দশ বছরের যিন্দেগীতে সর্বমোট যুদ্ধ/অভিযানের সংখ্যা ছিল তিয়াত্তরটি। অর্থাৎ বছরে গড়ে প্রায় সাতটির উপর যুদ্ধ/অভিযান পরিচালনা করেছিলেন আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ। আর নববী যিন্দেগীতেই আল্লাহর আইন কায়েম করেছিলেন এক বিস্তীর্ণ ভূমিতে যাকে 'জাযিরাতুল আরব' বলা হয়।

*** নবুওয়তের যামানার শাসনকাল- ৬২২-৬৩২ ঈসায়ী/ ১-১১ হিজরি।

*** শাসন এলাকার বিস্তৃতিঃ জাজিরাতুল আরব/আরব উপদ্বীপ। আয়তন ৬৪,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার। (বর্তমানে- সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও ইয়েমেন) [যা বাংলাদেশের আয়তনের ৪৩.৩৭ গুণ ছিল।]

আল্লাহর রাসূলের ﷺ চার ঘনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন রাসূলের উত্তরসূরি চার রাষ্ট্রনায়ক:

আল্লাহর রাসূলের ﷺ পর মুসলিম জাহানের অভিভাবক হন তাঁরই প্রিয় ও সবচেয়ে নৈকট্যশীল সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈন)।

খোলাফায়ে রাশেদার শাসনকাল: ৬৩২-৬৬১ ঈসায়ী/১১-৪০ হিজরী, ৩০ বছর।

খিলাফাতে রাশেদার খলিফাগণঃ

১. হযরত আবু বকর রাদি. : ১১- ১৩ হিজরি (৬৩২-৬৩৪ ঈসায়ী)

২. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি. : ১৩- ২৩ হিজরি (৬৩৪-৬৪৪ ঈসায়ী)

৩. হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদি. : ৬৪৪-৬৫৬ ঈসায়ী

৪. হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রাদি. : ৬৫৬-৬৬১ ঈসায়ী

৫. হযরত হাসান ইবনে আলী রাদি. : ৬৬১ ঈসায়ী

মানচিত্র: খোলাফায়ে রাশেদার আমলে (হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফত এর সময়) মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ বিস্তৃতি। (সবুজ অংশ)

শাসন এলাকার বিস্তৃতিঃ সমগ্র আরব উপদ্বীপ, লেভান্ট থেকে উত্তর ককেসাস, পশ্চিমে মিসর থেকে বর্তমান তিউনিসিয়া ও পূর্বে ইরানীয় মালভূমি থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত।

(বর্তমানে যার অংশ ৩১টি দেশঃ আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, সাইপ্রাস, মিশর, জর্জিয়া, গ্রীস, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, ইতালি, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, ওমান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, কাতার, রাশিয়া, সৌদি আরব, সুদান, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান, ইয়েমেন)

উমাইয়া খিলাফত

খোলাফায়ে রাশেদার পর মুসলিম জাহানের অভিভাবক হন উমাইয়াগণ। মূলধারার উমাইয়াদের (স্পেন বাদে) মোট খলিফার সংখ্যা ১৫ জন। তাদের শাসনকাল: ৪১-১৩২ হিজরি (৬৬১-৭৫০ ঈসায়ী)। ৭১১-১০৩১ ঈসায়ী (ইউরোপের স্পেনের কর্ডোভা অংশ)
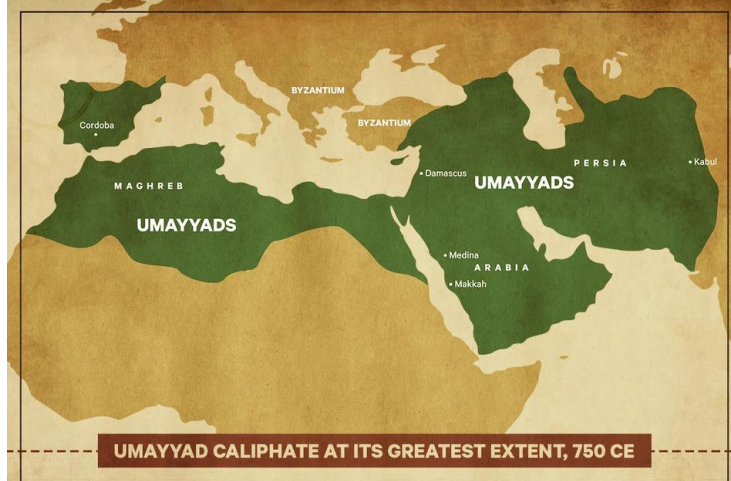
শাসন এলাকার বিস্তৃতিঃ জাযীরাতুল আরব, আফ্রিকার উত্তর অংশ, ইউরোপের বিশাল বিস্তৃত এলাকা, পূর্বে ভারতবর্ষের ও চীনের কিছু অংশ, উত্তরে শামদেশ ও রাশিয়ার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। আয়তন ১,৫০,০০,০০০ বর্গ কি.মি.। [যা বাংলাদেশের আয়তনের ১০১.৬৫ গুণ ছিল।]
(বর্তমানে- আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, অ্যান্ডোরা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, চীন, সাইপ্রাস, মিশর, ইরিত্রিয়া, ফ্রান্স, জর্জিয়া (রাষ্ট্র), জিব্রাল্টার (যুক্তরাজ্য), গ্রীস, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, জর্ডান, কাজাখস্তান, কুয়েত, কিরগিজিস্তান, লেবানন, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, ওমান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, পর্তুগাল, কাতার, রাশিয়া, সৌদি আরব, সোমালিয়া, স্পেন, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান, ইয়েমেন, পশ্চিম সাহারা)

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

হযরত আলি রাদি. এর ইন্তেকালের পর মদিনার মুসলমানগণ হযরত হাসান বিন আলি রাদি. এর হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করে। এর মাত্র ছয় মাস পর ৪১ হিজরি সনে হযরত হাসান রাদি. উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতির বৃহত্তর স্বার্থে হযরত মুয়াবিয়া রাদি. এর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এভাবে, উমাইয়া বংশের শাসন হযরত আমির মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) কর্তৃক সূচিত হয়। তিনি দীর্ঘদিন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। ফলে সিরিয়া উমাইয়াদের ক্ষমতার ভিত্তি হয়ে উঠে এবং দামেস্ক তাদের রাজধানী হয়।
উমাইয়ারা মুসলিমদের বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখে। পশ্চিমে তাদের অভিযান আন্দালুস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। পূর্ব দিকে মুহাম্মাদ বিন কাসিম আস্ সাকাফির হাতে বিজিত হয়েছিল সিন্ধু অঞ্চল, কুতায়বা বিন মুসলিম আল বাহিলির হাতে বিজিত হয়েছিল ট্রান্সঅক্সিয়ানা (মধ্য এশিয়া/মাঅরাউন নাহার) অঞ্চল; তার বিজয়াভিযান বিস্তৃত হয়েছিল সুদূর চীন পর্যন্ত। আর মাসলামা বিন আব্দুল মালিক আল মারওয়ানির হাতে বিজিত হয়েছিল উত্তরের ককেশাস অঞ্চল। সীমার সর্বোচ্চে পৌঁছালে উমাইয়া খিলাফত মোট ৫৭৯ মিলিয়ন বর্গ মাইল (১,৫০,০০,০০০ বর্গ কিমি) অঞ্চল অধিকার করে রাখে। তখন পর্যন্ত বিশ্বের দেখা সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ ছিল। অস্তিত্বের সময়কালের দিক থেকে এটি ছিল পঞ্চম। পরবর্তীতে ১৩২ হিজরি/ ৭৫০ ঈসায়ীতে আব্বাসীদের হাতে এই

খিলাফতের পতন ঘটে। আর এই পরিবারের একটি শাখা উত্তর আফ্রিকা হয়ে আন্দালুস চলে যায় এবং সেখানে উমাইয়া সাম্রাজ্য (আন্দালুস) প্রতিষ্ঠা করে। এ খিলাফত ৪২২ হিজরি (১০৩১ ঈসায়ী) পর্যন্ত টিকে ছিল এবং আন্দালুসের ফিতনার পর এর পতন হয়।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির বলেন, "উমাইয়া রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা সর্বদা উজ্জীবিত ছিল। তাদের যেন জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো ব্যস্ততাই ছিল না। তাদের শাসনামলে পৃথিবীর পূর্বে-পশ্চিমে, জলে স্থলে সর্বত্র ইসলামের কালিমা সমুন্নত হয়। তারা কুফর ও কুফুরি শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছেন। উমাইয়া শাসনামলে কাফির মুশরিকদের অন্তরাত্মা মুসলিম জাতির প্রভাব-ভীতিতে প্রকম্পিত থাকত। মুসলিম অভিযাত্রীগণ যে অঞ্চলেই অভিযান পরিচালনা করত, তা-ই জয় করত।" (ইবনে কাছির দামিশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া,* ৯/৮৩)

উল্লেখযোগ্য বিজয়/যুদ্ধঃ ইয়ামামার যুদ্ধ, বাইজেন্টাইন (রোম) ও সাসানীয় (পারস্য) সাম্রাজ্যের পতন, মিশর জয়, জেরুজালেম জয়, আর্মেনিয়া-আজারবাইজান জয়, কাদেসিয়ার যুদ্ধ ইত্যাদি।

আন্দালুস (মুসলিম স্পেন) এর ইতিহাস:

সিউটা প্রশাসক জুলিয়ানের আহ্বানে তাঞ্জিয়ার প্রশাসক তারিক বিন যিয়াদ রাহি. ৯২ হিজরি সনে (৭১১ ঈসায়ী) মোট বার হাজার সৈন্য নিয়ে আন্দালুসে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন।

আইবেরিয়ান উপদ্বীপকেই অতীতে আন্দালুস বলা হত। আধুনিক রাষ্ট্রসীমার স্পেন, পর্তুগাল ও অ্যান্ডোরা এই তিনটি দেশের, পাশাপাশি ফ্রান্সের অংশ এই আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অন্তর্ভূক্ত। আন্দালুসের শাসক রডারিক রাজধানী টলেডো হতে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রওনা হয়। উভয় বাহিনী সাজুনা নগরীর নিকটবর্তী বারবাত বা লুক্কা উপত্যকায় মুখোমুখি হয়। একটানা আটদিন যুদ্ধ চলার পর রডারিক বাহিনীর পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়। তারিক বিন যিয়াদ বিজয়াভিযান অব্যাহত রেখে ৯৩ হিজরী সনে (৭১২ ঈসায়ী) আন্দালুসের রাজধানী টলেডো (বর্তমান স্পেনের অন্যতম প্রাচীন নগরী) জয় করেন। মুসলিম জাহানের তৎকালীন খলিফা ছিলেন ষষ্ঠ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান।
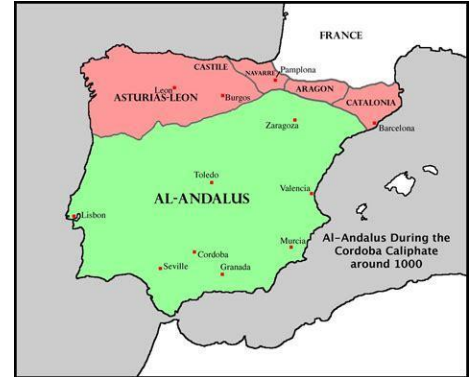
মানচিত্র: উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম আন্দালুস (সবুজ অংশ)

আন্দালুসে বনু উমাইয়ার স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র একশ বছর পর ২৩৮ হিজরি থেকে ৩০০ হিজরি পর্যন্ত সময়ে ইসলামি আন্দালুস খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কয়েকটি এলাকা নিয়ে একেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠিত হতে থাকে এবং বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলো নিজেদেরকে সাম্রাজ্য দাবী করতে থাকে।

অবশেষে, ৪২২ হিজরি সনে (১০৩১ ঈসায়ী) খলিফা মুতামিদ বিল্লাহর পতনের মধ্য দিয়ে আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে। আন্দালুসে মোট উমাইয়া শাসকের সংখ্যা ছিল উনিশজন।

উমাইয়াদের পতনের পর আন্দালুস আবারো খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়।

হায়! এদিকে মুসলিমদের জিহাদের ব্যাপারে গাফলতির সুযোগে তৎকালীন আন্দালুসের খ্রিস্টান অংশের প্রতাপশালী নেতা ষষ্ঠ আলফোন্সো ইসলামি ভূ-খণ্ডের প্রতি লালায়িত হয় এবং সে মুসলিমদের ভূমিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে একের পর এক ইসলামি দুর্গ জয় করতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ৪৭৮ হিজরি (১০৮৫ ঈসায়ী)-তে আন্দালুসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরী টলেডো জয় করে ফেলে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই সে পুরো ইসলামী আন্দালুস গিলে ফেলবে।

মানচিত্র: ষষ্ঠ আলফোন্সোর সময় ইসলামিক আন্দালুস (সবুজ অংশ)

*** ইউসুফ বিন তাশফীন: লাঞ্ছনার মাঝে এক টুকরো বীরত্ব-গৌরব!

এসময় মুসলিম শাসকবৃন্দ অনুভব করেন যে, প্রণালির ওপারের আফ্রিকার মুরাবিতি সাম্রাজ্যের শাসক ইউসুফ বিন তাশফিনই পারেন এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ইসলামি আন্দালুসের সহায়তায় এগিয়ে আসতে। ইউসুফ বিন তাশফিনের নেতৃত্বাধীন মুরাবিতি সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন মাগরিব অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। আর তাই আন্দালুসবাসী তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ আর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর প্রতি সহজাত আকর্ষণের দাবীতে ইউসুফ বিন তাশফিন তাদের ডাকে সাড়া দেন।

*** জাল্লাকার যুদ্ধ: (The Battle of Zallaqa/ Sagrajas):

ইউসুফ বিন তাশফিন আন্দালুসের খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য বাহিনী নিয়ে 'জাবালে তারিক' (জিব্রাল্টার) প্রণালি পাড়ি দিয়ে আন্দালুস উপকূলের জাযিরাতুল খাযরায় অবতরণ করেন।

এদিকে খ্রিস্টান অধিপতি ষষ্ঠ আলফোন্সো এক বিশাল বাহিনী গঠন করে। তার বাহিনীর বিশালতা দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেই বলে উঠে, "এই সুবিশাল বাহিনী নিয়ে আমি জিন-মানুষ এমনকি আসমানের ফেরেশতাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে পারি।" তার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে সর্বোচ্চ যে হিসাব পাওয়া যায় তা এই- তার বাহিনীর অশ্বারোহীই ছিল পঞ্চাশ হাজার, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে আশি হাজারের উপর। পদাতিক ছিল দুই লক্ষের উপর। সব মিলিয়ে তিন লক্ষের উপর। [ইসলামী ইতিহাস, ড. রাগেব সারাজানী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২১] অন্যদিকে, মুসলিম সৈন্যদের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল খ্রিস্টানদের সংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ। তবে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সম্পর্কে সর্বনিম্ন যে হিসাব পাওয়া যায় সে অনুযায়ী মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র বিশ হাজার। [https://bit.ly/zallaqa]

যাইহোক, বাতালইয়ুসের নিকটবর্তী জাল্লাকা প্রান্তরে দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়।

যখন উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের দিন নির্দিষ্ট করার জন্য পত্র বিনিময় হয়, তখন আলফোন্সো প্রতারণার আশ্রয় নেয় এবং বলে যে, "আগামীকাল শুক্রবার আর তা মুসলিমদের সাপ্তাহিক আনন্দের দিন। তাই সেদিন আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই না। তার পরের দিন শনিবার, আর তা ইহুদীদের আনন্দের দিন। যেহেতু আমাদের এ অঞ্চলে প্রচুর ইহুদী আছে, তাই আমাদের উচিত তাদের দিকটিও খেয়াল রাখা। আর এর পরদিন হলো রোববার, আমাদের

আনন্দের দিন।। সুতরাং , আসুন, আমরা এসব আনন্দের দিনগুলোর সম্মান বজায় রাখি। সোমবারেই পরস্পরের সাক্ষাৎ হবে।"

৪৭৯ হিজরি সনের ১২ রজব (১০৮৬ ঈসায়ীর ২৩ অক্টোবর) শুক্রবার বাদ ফযর ইউসুফ বিন তাশফীন যখন ফজরের নামাজের উদ্দেশ্যে বের হন, তখনই খ্রিস্টান বাহিনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশ্য আন্দালুসের খ্রিস্টানদের সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় মুসলিমরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। শুরু হয় ইতিহাসের অন্যতম আরেকটি ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী অসম যুদ্ধ। মুসলিম বাহিনী প্রবল বিক্রমে খ্রিষ্টান সৈন্যদের মুলা-গাজর আর টমেটোর মত কাটতে থাকে। মধ্যরাত পর্যন্ত কুফ্ফারদের উপর এই হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। অবশেষে সুবিশাল খ্রিষ্টান বাহিনীর পতন ঘটে। এরপর আলফোন্সো বাহিনীর কী হল, জানেন কী? দাম্ভিক আলফোন্সো মাত্র পাঁচশ ক্রুসেডার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে সক্ষম হয়। তার মানে?

তার মানে হল, তিন লক্ষ ক্রুসেডার সৈন্য মুজাহিদদের হাতে একদিনেই নিহত হয়। অন্যদিকে মাত্র তিন হাজার মুজাহিদ শহিদ হন। সুবহানাল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য, যিনি মুজাহিদদের পাশে সব সময় থাকেন।

وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ ١٢٦

"আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে।" (সূরা আল ইমরান ৩:১২৬)

فَلَمۡ تَقۡتُلُوهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمۡۚ وَمَا رَمَيۡتَ إِذۡ رَمَيۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ

"সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ।" (সূরা আনফাল ৮:১৭)

পরবর্তীতে, ইউসুফ বিন তাশফিন রাহি. এর হাত ধরে পুরো ইসলামী আন্দালুস আফ্রিকার মুরাবিতি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। মুরাবিতি শাসনের মাধ্যমে শান্তি ফিরে আসায় আন্দালুসের মুসলমানগণ সীমাহীন আনন্দিত হয়।

কালের পরিক্রমায় আন্দালুসের মুসলমানগণ ঐশ্বর্য ও বিলাসী জীবনের হাতছানিতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারা ভুলে যায় নিজেদের পরিচয় এবং শত্রুর পরিচয়। তারা ভুলে যায় 'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ্'র আকীদা। ভুলে যায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর আদর্শ! ভুলে যায় যুগে-যুগে কারা তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে এবং কারা তাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে একজোট হয়েছে। আর তাই আন্দালুস ও ইসলামের শত্রুরা যখন তরবারিতে শান দিচ্ছিল এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, আন্দালুসের মুসলমানরা তখন মত্ত ছিল সুর ও সুরার নেশায় এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতায়। ফলাফল যা হওয়ার, তা-ই হয়েছিল। অবশেষে ৮৯৭ হিজরি সনের ২ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৪৯২ ঈসায়ীর ২ জানুয়ারি অ্যারোগানের খ্রিস্টান শাসক ফার্ডিনান্ডের বাহিনীর হাতে আন্দালুসের শেষ ইসলামি দুর্গ গ্রানাডার পতন ঘটে।

আব্বাসী খিলাফত

উমাইয়াদের পর মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক হন আব্বাসীগণ। মোট খলিফার সংখ্যা ৩৪ জন। তাদের শাসনকাল ছিল: ১৩২-৯২৩ হিজরি (৭৪৯-১৫১৭ ঈসায়ী)।

শাসন এলাকার বিস্তৃতিঃ পশ্চিমে জাযীরাতুল আরব, আফ্রিকার উত্তর অংশ, পূর্বে ভারতবর্ষের ও চীনের কিছু অংশ, উত্তরে শামদেশ ও রাশিয়ার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। আয়তন ১,১১,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। [যা বাংলাদেশের আয়তনের ৭৫ গুণ ছিল।]

(বর্তমানে দেশসমূহঃ অ্যান্ডোরা, আজারবাইজান, আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া, আলজেরিয়া, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, ইসরায়েল, উজবেকিস্তান, ওমান, কাজাখস্তান, কাতার, কিরগিজিস্তান, কুয়েত, জর্জিয়া, জর্ডান, জিব্রাল্টার, তাজিকিস্তান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, পর্তুগাল, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, মাল্টা, মিশর, রাশিয়া, লিবিয়া, লেবানন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সাইপ্রাস, সিরিয়া, সৌদি আরব।)

আব্বাসী খিলাফতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

আব্বাসীয় খিলাফত নবী মুহাম্মদ ﷺ এর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের কর্তৃক ১৩২ হিজরি (৭৫০ ঈসায়ী) কুফায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আস্-সাফাহ আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. এর বাহিনী উমাইয়াদের সমূলে নিঃশেষ করে উমাইয়া খিলাফতের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ আন্দালুস ব্যতীত পুরো মুসলিম বিশ্বে আব্বাসী খিলাফা কায়েম করেন। ৭৬২ ঈসায়ীতে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। এই যুগে মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়। এক পর্যায়ে খলিফারা বিলাসিতায় গা ভাসালে মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের বাগদাদ দখলের পর ১২৫৮ ঈসায়ীতে (৬৫৬ হিজরি) আব্বাসীয় খিলাফত বিলুপ্ত হয়। এর পর মামলুক শাসিত মিশরে অবস্থান করে তারা ১৫১৭ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত নামে মাত্র ধর্মীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব থাকে। ১৫১৭ সালে (৯২৩ হিজরি) মিশরে উসমানীয়দের দ্বারা মামলুকদের পতন ঘটলে আব্বাসী খিলাফাতের চূড়ান্ত বিলুপ্তি ঘটে ও উসমানী খেলাফত শুরু হয়।

ক্রুসেড যুদ্ধ ও আইয়ুবী রাষ্ট্র:

মুসলিম ভূ-খণ্ডে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের হিংস্র ও বর্বর আগ্রাসন আব্বাসী খিলাফতের প্রতি অনুগত দুটি মহান রাষ্ট্রের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়- জিনকি রাষ্ট্র ও আইয়ুবি রাষ্ট্র। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই দুটি রাষ্ট্রকে যেন সৃষ্টিই করেছিলেন- ইসলামি প্রাচ্যে ইউরোপীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে এবং তাদের এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে ছয়শ বছরেরও অধিক সময় পিছিয়ে দিতে।

৪৯২ হিজরি সনের শাবান মাসে (১০৯৯ ঈসায়ীর জুলাই মাসে) প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধে বাইতুল মুকাদ্দাসের পতন ঘটে। খ্রিষ্টানরা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে একের পর এক নয়টি ক্রুসেড যুদ্ধ পরিচালনা করে। আল কুদস ও শামের বিভিন্ন অঞ্চল জবরদখল করার পর খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা দামেশকসহ অবশিষ্ট শাম এবং পরে মিশর জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তাদের স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি রাহি. এক অব্যাহত জিহাদের ধারা শুরু করেন। ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় অনন্যসাধারণ ভূমিকা রাখেন সুলতান ইমামুদ্দিন জিনকি ও তার বংশধরগণ। ইরাকের মসুল, জাযিরা ও শামের বিজিত এলাকাগুলোতে ইমাদুদ্দিন জিনকির হাতে সূচিত হয় জিনকি রাষ্ট্র।

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য শিষ্য সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এক সুবিশাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যার ব্যাপ্তি ছিল উত্তর ইরাক (কুর্দিস্থান), শাম, মিশর ও বারকা অঞ্চলজুড়ে। এটিই ইতিহাসে 'আইয়ুবি রাষ্ট্র' হিসেবে পরিচিত।
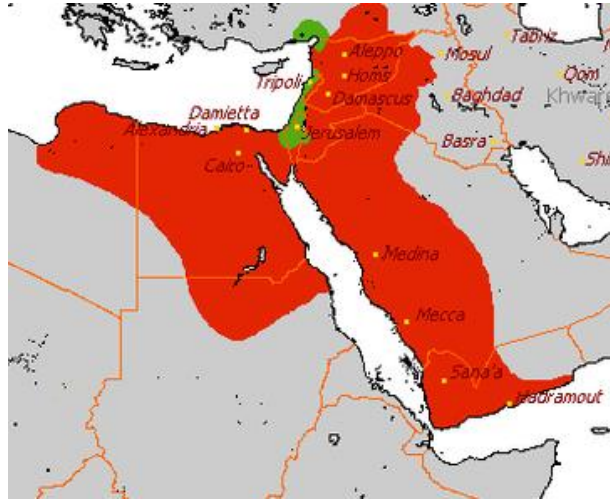
চিত্র: আইয়ুবী সাম্রাজ্য।

৫৮৩ হিজরি সনে (১১৮৭ ঈসায়ী) সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে দামেশক থেকে বের হন। এদিকে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বিস্তৃত পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সমকালীন খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে। উভয় বাহিনী হিত্তিন নামক স্থানে পরস্পর মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনী পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশের পানির উৎসগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করায় ক্রুসেডার বাহিনী এসময় প্রচণ্ড পানির স্বল্পতার সম্মুখীন হয়।

উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের পর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেন। চরমভাবে পরাজিত ক্রুসেডার বাহিনীর একজন সদস্যও পালিয়ে যেতে পারেনি। তারা হয়তো নিহত হয়, নতুবা বন্দী হয় । যুদ্ধে নিহত ক্রুসেডার সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার।

অবশেষে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী ৫৮৩ হিজরি (১১৮৭ ঈসায়ী)-তে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করেন।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রাহি. পবিত্র নগরী আল কুদস পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে তাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যপানে একধাপ এগিয়ে নেন। আর এর সফল পরিসমাপ্তি ঘটে চার মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ, রুকনুদ্দিন বাইবার্স, সাইফুদ্দিন কালাউন ও আল আশরাফ খলিলের মাধ্যমে।

উসমানী খিলাফত:

উসমানী খিলাফতের শাসনকাল: ৬৯৮-১৩৪২হিজরি (১২৯৯-১৯২৪ ঈসায়ী)

সুলতান ও খলিফাগণ: উসমানি সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান ছিলেন প্রথম উসমান। ০৯ নং সুলতান প্রথম সেলিমের সময় ৯২৩ হিজরি/১৫১৭ সালে উসমানি সালতানাত খিলাফতে রূপান্তরিত হয়। তাই প্রথম সেলিম উসমানী খিলাফতের প্রথম খলিফা। সর্বশেষ খলিফা ছিলেন দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ (৩৭ তম সুলতান)।

শাসন এলাকার বিস্তৃতি:

আমাদের পূর্বপুরুষ উসমানীরা পৃথিবীর এমন সব ভূ-খণ্ডে ইসলামকে বিজয়ী করেছিল, যা দ্বিতীয় কোনো মুসলিম শাসকের শাসন করার সৌভাগ্য হয়নি।

হ্যাঁ! একমাত্র উসমানিরাই পেরেছিল ইউরোপের হৃদপিণ্ডে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে। তারা জয় করেছিল- গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া (বর্তমান সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো ও ক্রোয়েশিয়া), বসনিয়া, হার্জেগোবিনা, আলবেনিয়া, মেসিডোনিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, মালদোভা, ইউক্রেন, সাইপ্রাস, রাশিয়ার বিরাট অংশ, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া,

ইতালী। তথা তৎকালীন অর্ধ ইউরোপ ছিল উসমানিদের পদানত। এদিকে সম্পূর্ণ এশিয়া মাইনর তথা আধুনিক তুরস্ক, আর্মেনিয়া, জর্জিয়াসহ সমগ্র ককেশাস অঞ্চল, আফ্রিকার উত্তর অংশ, জাজিরাতুল আরব, ইরাক, শাম উসমানীদের শাসনের আওতাধীন ছিল। আয়তন ছিল ৫২,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার। অবশেষে উসমানিদের বিজয়যাত্রা ভিয়েনার দুর্গপ্রাচীর পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ায়।

** কনস্টান্টিনোপল বিজয়:

উসমানিদের গৌরবের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সপ্তম উসমানী সুলতান ২৩ বছর বয়সী (দ্বিতীয়) মুহাম্মাদ আল ফাতিহর হাতেই ৮৫৭ হিজরি (১৪৫৩ ঈসায়ী) সনে কনস্টান্টিনোপল বিজিত হয়েছিল এবং এরই মাধ্যমে উসমানিরা বাইজেন্টাইন (রুম) সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করে। অথচ সুদীর্ঘ ৭০০ বছর বহু মর্দে মুজাহিদ অসংখ্যবার চেষ্টা করেও এই নগরীটির চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনি। সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রিয় নবীজি ﷺ-এর এই ভবিষ্যদ্বানী যথেষ্ট:

(لَتُفْتَحَنَّ القُسطَنْطِينِيَّةُ فلنعمَ الأميرُ أميرُها ولنعمَ الجيشُ ذلك الجيش) -رواه أحمد (١٨٩٧٩)، والحاكم في "المستدرك(٤ / ٥٨٤)

"কনস্টান্টিনোপল অচিরেই বিজয় হবে। কতই না উত্তম তার বিজেতা, আর কতই না উত্তম সেই বাহিনী।"

(আহমাদ- ১৮৯৭৯, মুসতাদরাকে হাকেম- ৪/৫৮৪)

কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ তার বিজয়াভিযানে মনোনিবেশ করেন। এরপর তিনি সার্বিয়া, মুরা (দক্ষিণ গ্রীস), ওয়ালাচিয়া (বর্তমান রোমানিয়ার অংশ), বসনিয়া, ক্রিমিয়া, ক্রোয়েশিয়ার কিছু অংশ, মন্টেনিগ্রো, আলবেনিয়ার কিছু অংশ, ট্রান্সসিলভানিয়া (প্রাচীন পশ্চিম রোমানিয়া), ইতালীর অটারেন্ট শহর, আনাতোলিয়ার সর্বশেষ খ্রিস্টান রাজ্য ট্রাবজোন, কিরমান রাজ্য ইত্যাদি জয় করেন।

এই মহান সুলতান জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি একের পর এক রাজ্য জয় করেছিলেন। এজন্য তার উপাধি হয়ে যায় আল-ফাতিহ বা বিজেতা। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র দিগ্বিজয়ী যিনি এই উপাধি লাভ করেন। সর্বশেষ তিনি ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র ইতালি জয় করারও প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাকদীরের ফয়সালা ছিল ভিন্ন। তিনি রবের সান্নিধ্যে গমন করেন। আল্লাহ পাক তাকে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

মুসলিম তাতারী শাসন:

প্রিয় ভাই, তাতার কিংবা মোঙ্গল নাম শুনলেই আজ আমাদের কল্পনায় পাশবিকতা, ধ্বংসলীলা ও নির্মমতার এমন সব চিত্র ভেসে ওঠে- যার সাথে মানবতার ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। কিন্তু আমরা জানি কি, মুসলমানদের ভূ-খণ্ডে প্রবেশের পঁয়ত্রিশ বছর পর মোঙ্গলদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং একশ বছরের মধ্যে আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে তাতাররা প্রায় সকলেই কলেমা পড়নেওয়ালা আমাদের ভাই-বোন হয়ে যান??? তারা এসেছিল মুসলমানদের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে মুসলিম ভূমিগুলোকে জয় করতে, কিন্তু তার আগেই 'ইসলাম' তাদের সকলের অন্তর জয় করে নেয়! আলহামদুলিল্লাহ!!!

আমরা তো শুধু তাতারদের উত্থানকালের বর্বরতা আর আইনে জালুতের প্রান্তরে মুসলমানদের হাতে তাদের পরাজয়ের ইতিহাসই জানি। কিন্তু আমরা কি জানি, তাতারদের এর পরের ইতিহাস? চেঙ্গিস খান, হালাকু খান আর তৈমুর লং-এর পরের ইতিহাস?? শোষণ আর হত্যা ছাড়া মুসলমানদের ইতিহাসে মোঙ্গলদের আর কোনো অবদান ছিল কি?? অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ইতিহাসে অদ্বিতীয় নিপীড়ন ও রক্তক্ষরণের ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষণকালের মধ্যেই মোঙ্গল ভাইয়েরা সর্বোচ্চ মানবতা ও সম্প্রীতির এক অধ্যায় রচনা শুরু করে। আমাদের অনেক তাতার ভাইদের দিয়ে আল্লাহ্ পাক ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। বহু ভূ-খণ্ড বিজয় করে তারা সেখানে মুসলমানদের ভিত মজবুত করেছেন, যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। বরং তাদের অনেকে ইসলামের খাতিরে স্বজাতির সঙ্গে যুদ্ধও করেছেন।
মুসলিম তাতার সাম্রাজ্যকে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা

তাতার সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ:

পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম সাইবেরিয়ায় মোঙ্গল শাসন

*** চেঙ্গিস খানের বড় ছেলে জোচি খানকে প্রদেয় রাশিয়া, বুলগেরিয়া, ককেশাস অঞ্চল, পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম সাইবেরিয়া । এই অঞ্চলকে গোল্ডেন হোর্ড-ও বলা হয়। এর রাজধানী ছিল সারাই শহর।

*** গুরুত্বপূর্ণ শাসকবৃন্দ: বাতু খান, বারকে খান (প্রথম মুসলিম তাতার শাসক), মাংকো তৈমুর, তোদান মাংকো, গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মাদ উজবেক, মাহমুদ জানি বেগ, মুহাম্মাদ বারদি বেগ ইত্যাদি।

তাতার সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ভাগ:

ইলখানিয়া সাম্রাজ্য তথা পারস্য, খোরাসান এবং আরব ও এশিয়া মাইনর অঞ্চল। চেঙ্গিস খানের পুত্র তুলুইকে এই অংশ দেয়া হয়।

*** শাসকবৃন্দঃ হালাকু খান, আবাকা খান (হালাকু খানের পুত্র), তেকুদার (হালাকু খানের আরেক পুত্র ও প্রথম মুসলিম শাসক), আরগুন, গাজান (মুসলিম ছিলেন এবং তার পরবর্তী ইলখানাত শাসকবৃন্দ মুসলমান ছিলেন), উলজাতু, আবু সাইদ ইত্যাদি। আবু সাইদ ছিলেন ইলখানিয়া সাম্রাজ্যের শেষ শাসক।

তাতার সাম্রাজ্যের তৃতীয় ভাগ:

অঞ্চলসমূহ: চেঙ্গিস খানের পুত্র ওগেদাইয়ের শাসিত অঞ্চলসমূহ তথা চীন, মোঙ্গল ও পূর্ব তুর্কিস্তান (উইঘুর অঞ্চল)

শাসকবৃন্দ: ওগেদাই, গুয়ুক খান। গুয়ুক খানের পর ওগেদাইয়ের সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

প্রথম ভাগে, মঙ্গোলিয়া ও পূর্ব তুর্কিস্তানে (উইঘুর অঞ্চল) ওগেদাইদের শাসন চলে। পরবর্তীতে এ অঞ্চলের শাসনে চাগতাই পরিবার প্রবেশ করে। এ অঞ্চলের রাজধানী ছিল কারাকোরাম।

অন্যদিকে বিশাল চীনা অঞ্চলের শাসক হন কুবলাই খান। তার রাজধানী ছিল বেইজিং।

তাতার সাম্রাজ্যের চতুর্থ ভাগ:

অঞ্চলসমূহ: পুরো তুর্কিস্তান, উইঘুরদের রাজ্য কাংসু এবং মা-অরাউন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা)

শাসকবৃন্দ: চাগতাই, মোবারক শাহ (এ অঞ্চলের প্রথম মুসলিম শাসক), বুরাক খান, মুহাম্মাদ খান, তুঘলক খান, তৈমুর লং। তৈমুরের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। এরপর আসে মোঙ্গল শাইবানি ও জানিয়া বংশের শাসন। এরপর রুশ আগ্রাসনের শিকার হয় প্রায় সমগ্র তুর্কিস্তান।

কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর ১৩৩৮ হিজরি (১৯২০ ঈসায়ী) সনে রুশ বাহিনীর হাতে বুখারার পতন হয়। ইসলামের প্রাচীনতম শহরটিতে কম্যুনিস্ট লাল পতাকা উড্ডীন হয়।

তাতার সাম্রাজ্যের পঞ্চম ভাগ:

ভারতবর্ষের মোঙ্গল বা মোঘল সাম্রাজ্য।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন:

ভারতীয় উপমহাদেশ (হিন্দুস্তান/ হিন্দ) বর্তমান ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ নিয়ে গঠিত। ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ঘটে বণিক, দাঈ আর সৈনিকদের হাত ধরে। হযরত উমর রাদি. এর সময় ভারতমুখী কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও ব্যাপক পরিসরে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে উমাইয়া শাসনামলে; ৯২ হিজরিতে (৭১১ ঈসায়ী সনে) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক প্রেরিত তার ভাতিজা ও জামাতা বীর মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে। আব্বাসীয় আমলে সিন্ধের গভর্নর হিশাম বিন আমর তাগলিবি মুলতান ও কাশ্মির জয় করেন।

আফগানিস্তানের গজনি কেন্দ্রিক গজনবী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুবুক্তগিন হিন্দুস্তানের পাঞ্জাব পর্যন্ত জয় করেন। তার পুত্র সুলতান মাহমুদ গজনবি ১৭ বার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সিন্ধু অঞ্চলের এলাকাগুলো জয় করতে সক্ষম হন।

গজনবি শাসনের পর ভারতের সিংহাসন অলঙ্কৃত করে মুসলমানদের ঘুরি শাসন, মামলুক শাসন, খলজি শাসন, তুঘলক শাসন, মোঘল/মোঙ্গল শাসন। এই মোঘলরাই মোঙ্গল বা তাতার নামে পরিচিত। মোঘল শাসকদের নাম: বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, শাহজাহান, আউরঙ্গজেব (আলমগীর)।

ভারতবর্ষে মুসলমানরা প্রায় ছয়শত বছর শাসন করে। ইসলামের আগমনের পূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা একে অপরের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হত। ইসলামের আগমনে হিন্দুস্তানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় ভারতীয় সমাজে জাতপ্রথা ছিল প্রবল। ইসলামের আগমন হিন্দুদের জীবনে বিশেষ করে নিচু জাতের হিন্দুদের জন্য বয়ে আনে আশীর্বাদ ও রহমত। সকল জাতের হিন্দুরা নির্বিঘ্নে তাদের ধর্ম পালন করতে থাকে। সেই সময় ভারত ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রগুলোর একটি। শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্যবিদ্যা সকল ক্ষেত্রেই ভারতের সুনাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল।

এদিকে ডাচ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, আর্মেনিয়ান, ইংরেজ ও ফরাসী-এ সকল ইউরোপীয়ানরা প্রত্যেকেই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করার স্বপ্ন লালন করত। কিন্তু ইংরেজরাই সবচেয়ে সফল হয়। ইংরেজরা প্রথমে অবতরণ করে মাদ্রাজে (বর্তমান নাম চেন্নাই)। প্রথমে তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশজুড়ে জমি কিনে দুর্গ নির্মাণ করে। এরপর একে একে সমগ্র ভারতবর্ষই দখল করে নেয়। মীর জাফর, জগৎশেঠ আর রাজবল্লভের গাদ্দারীর ফলে ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে ইংরেজরা বাংলা দখল করে নেয়।

সিদ্ধান্ত:

প্রিয় ভাই! উপরের আলোচনা থেকে এটি কি প্রতীয়মান হয় না যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার এক বিশাল অংশ রাজত্ব করেছিলেন? এ আরব আমাদের, এ চীন আমাদের, এ রাশিয়া আমাদের, আফ্রিকা আমাদের, ইউরোপ আমাদের, এ উম্মাহ্ এসকল ভূমির উত্তরাধিকারী! আমাদের বীর পূর্বপুরুষেরা এসকল ভূমিতে আল্লাহর আইন কায়েম করেছিলেন। তারা এসকল ভূমির শাসনকর্তা ছিলেন। আমরা তাদের সন্তান, তাদের রূহানী উত্তরসূরী, রূহানী রাজকুমার। সুতরাং তাদের সন্তান হিসেবে আমাদের উপর ফরযে আইন দায়িত্ব হল আমাদের পিতৃভূমিগুলো কুফফারদের হাত হতে উদ্ধার করে সেগুলোতে পুনরায় আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

الشيخ عبد الله عزام -رحمه الله:

ولذلك الجهاد فرض عين الآن على الأمة الإسلامية جمعاء، ليس من الآن، بل من يوم سقطت الأندلس، من ١٤٩٢ ميلادي، قبل خمس قرون صار فرض عين، وخلال خمس قرون الأمة كلها آثمة، لأنها لم ترجع الأندلس، الآن الجهاد فرض عين، ولا ينتهي بتحرير أفغانستان، ولا بتحرير فلسطين، ينتهي فرض العين عندما نرجع كل بقعة، كانت في يوم من الأيام تحت راية لا إله إلا الله، فالجهاد فرض عين عليك حتى تموت، كما أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا مات فالجهاد لا يسقط على الإنسان إلا إذا مات أبدا، احمل سيفك وامض في الأرض، لا ينتهي فرض العين أبدا حتى تلقى الله، وكما أنه لا يجوز أن تقول صمت العام الماضي هذه السنة أريد أن أستريح، أو صليت الجمعة الماضية وهذه الجمعة أريد أن أستريح، كذلك لا يجوز أن تقول جاهدت السنة الماضية وهذه السنة أريد أن أستريح.

শাইখ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রাহিমাহুল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

"…….জিহাদ গোটা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরযে আইন হয়ে আছে। আর তা কেবল এখন থেকে নয় বরং যেদিন ইসলামী আন্দালুস তথা স্পেনের পতন ঘটেছে, সেই ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ তথা আজ থেকে পাঁচ শতাব্দী ধরে ফরযে আইন হয়ে আছে। আর গোটা এই পাঁচশত বছর যাবত মুসলিম উম্মাহ সামগ্রিকভাবে গুনাহগার হয়ে আছে কারণ আন্দালুস এখনো পুনরুদ্ধার হয়নি।

আজ যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে আছে তখন তা কেবল আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিন স্বাধীন হবার মাধ্যমেই আমাদেরকে দায়িত্বমুক্ত করবে না। বরং ফরজ দায়িত্ব তখনই পুরোপুরি পালিত হবে যখন এমন প্রতিটি ভূ-খণ্ড পুনরুদ্ধার হয়ে যাবে, একদিনের জন্য হলেও যেখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা উচ্চকিত ছিল।

অতএব আপনার উপর জিহাদ ফরয থাকবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, যেমনিভাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ নামাজের ফরজ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। অতএব মৃত্যু অবধি সকল মানুষের উপর জিহাদ ফরজে আইন। অতএব আপনি আপনার তরবারি হাতে নিন এবং জমিনের উপর বিচরণ করতে থাকুন। আল্লাহর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটবার আগ পর্যন্ত এই ফরজে আইন দায়িত্ব শেষ হবে না।

আর যেমনিভাবে কারো জন্য এ কথা বলা জায়েজ নেই যে, আমি গত বছরের সিয়াম পালন করেছি, তাই এ বছর আমি বিশ্রাম নিতে চাই অথবা আমি গত সপ্তাহের জুমার সালাত আদায় করেছি অতএব এই সপ্তাহে আমি বিশ্রাম নিতে চাই। একই ভাবে এ কথা বলাও জায়েজ হবে না যে, আমি গত বছর জিহাদ করেছি তাই এ বৎসর আমি বিশ্রাম নিতে চাই।" (نصيحة الأمة الموحدة بحقيقة الأمم المتحدة : শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ, পৃ. ১৬, ১৭)

[বি.দ্র: জিহাদ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসাইল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন: **কিতাবুত তাহরীদ্ 'আলাল ক্বিতাল: দ্বিতীয় পর্ব- তাওহীদ ও জিহাদ**: https://archive.org/details/kitabuttahrid২ ;

ইসলামের ইতিহাস নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যবহুল আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে অধম (লেখক) কর্তৃক লিখিত "**কালজয়ী ইসলাম**" কিতাবটিতে। আমরা ইনশাআল্লাহ কিতাবটি পড়ে নিতে পারি। পিডিএফ লিংক: https://bit.ly/kaljoie-islam; টেক্সট লিংক: https://justpaste.it/3ppxx]

কী আমাদের আত্মপরিচয়? কেমন ছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী সালাফ/আকাবীরগণ?

আত্মপরিচয় ভুলে যাওয়া এক সিংহশাবকের কাহিনী

প্রিয় ভাই! এই অধ্যায়টি আমরা আরেকটি কল্পিত গল্প দিয়ে শুরু করতে চাই। আর সেটি হল আত্মপরিচয় ভুলে যাওয়া এক সিংহশাবকের কাহিনী। চলুন, কাহিনীটি শুনা যাক.................

একদা এক বনে এক সিংহ বাস করত। সিংহটির দুটি সিংহশাবক ছিল। একবার একটি সিংহশাবক হারিয়ে গেল। সিংহশাবকটিকে এক রাখাল পেয়ে তার ভেড়ার পালের সাথে পালতে শুরু করে। সিংহশাবকটিও ভেড়ার পালের মধ্যে বড় হতে থাকে। যখন তার কিছুটা জ্ঞান বুদ্ধি হয়, তখন সে নিজেকে 'ভেড়ার বাচ্চা' ভাবা শুরু করে। শুধু তাই নয়, সে নিজেকে অন্যান্য ভেড়া থেকে আলাদা আবিষ্কার করে এবং ভাবতে থাকে- সে বোধ হয় অন্যান্য ভেড়া থেকে দুর্বল এবং বিকৃত চেহারার অধিকারী; এমনকি সে অনেক চেষ্টা করেও ভেড়ার মতো ডাকতে পারে না। অন্যান্য ভেড়ার মতো সে ঘাসও খেতে পারে না। ফলে সে কম খেয়ে খেয়ে দুর্বল হতে থাকে। এরকম নানাবিধ কারণে সে নিজেকে অসহায় মনে করে এবং অন্যান্য ভেড়ার বাচ্চারা তাকে গুতো দিলেও সে কিছু বলেনা বা প্রতিবাদ করার সাহস পায়না। সে সবসময় চুপচাপ থাকে এবং নিজের নিয়তি ভেবে সব কিছু মাথা পেতে নেয়।

একদিন ঐ রাখাল তার ভেড়ার পাল এবং ঐ সিংহ শাবককে নিয়ে বনে চড়াতে নিয়ে যায়। এদিকে হারিয়ে যাওয়া ঐ সিংহশাবকের মা তার আরেক সিংহশাবককে নিয়ে ঐ বনের এক পাশ হতে একজন মানুষ এবং তার সাথে একটি পশুর পাল আসতে দেখে। হঠাৎ করে সিংহমাতার দৃষ্টি তার হারিয়ে যাওয়া শাবকের উপর পড়ে। দৃষ্টি পড়া মাত্রই সে এবং আরেক শাবক ঐ পালের উপর হামলা করে বসে। আর উদ্ধার করে ভেড়ার পালের মধ্যে আটকে পড়া সেই সিংহশাবককে। রাখাল তার ভেড়ার পাল নিয়ে দ্রুত বন ত্যাগ করে।

এদিকে উদ্ধার হওয়া সিংহশাবক মৃত্যুর ভয়ে কাঁপতে থাকে। সে বলতে থাকে, "আমাকে মেরো না! আমাকে খেয়ো না! আমি একজন প্রতিবন্দী, দুর্বল ও অসহায় ভেড়ার বাচ্চা। আমাকে ক্ষমা কর তোমরা। প্লিজ আমাকে মেরো না!"

সিংহমাতা বুঝতে পারলো ব্যাপারটা কী; সে বুঝতে পারল তার শাবকটি মানসিকভাবে প্রতিবন্দী হয়ে গিয়েছে। তাই সে তাকে বুঝাতে লাগল, "আরে বেটা! তুমি তো ভেড়ার বাচ্চা নও। তুমি একজন সিংহের বাচ্চা। এই যে আমি তোমার মা আর এ তোমার আরেক ভাই। তুমি ছোট সময় হারিয়ে গিয়েছিলে। আহ! তোমাকে কতই না খুঁজেছি! খোদার শোকর যে তোমাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছি।"

তার আরেক ভাইটি বলল, "দেখ ভাই! তুমি কেন নিজেকে ভেড়া ভাবছ? দেখ দেখ, আমি যেমন দেখতে তুমিও তেমনি। আমার যেমন কেশর আছে, তোমারও আছে। আমার যেমন নখ আছে, তোমারও আছে। আমার দেহের গঠন যেমন, তোমারও তেমনি। তাহলে তুমি ভেড়ার বাচ্চা কিভাবে হলে, তুমি হলে সিংহের বাচ্চা। আমি যেমন গর্জন করতে পারি তুমিও পারবে। চেষ্টা করো তুমিও পারবে।" একথা বলে সে গর্জে উঠল।

উদ্ধার হওয়া সিংহশাবকটি প্রথমে গর্জন শুনে একটু ভয় পেয়ে গেলেও সাথে সাথে সেও চেষ্টা করতে লাগল। দেখল যে সেও গর্জন করতে পারছে। এইবার তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, সে আসলেই সিংহশাবক, সাচ্চা সিংহের বাচ্চা। এইবার তার যত ভয় এবং হীনমন্যতা সে ভুলে গেল।

কিছুদিন পর সিংহী মা তার বাচ্চাদের নিয়ে সেই ভেড়ার পালের উপর হামলা করে বসল। এইবার ভেড়াগুলো দেখতে পেল, তাদের মধ্যে বেড়ে উঠা সেই সিংহশাবকটি (যে কিনা আগে ভেড়ার পালের মধ্যে অসহায় হয়ে পড়ে থাকত) বীরদর্পে হুঙ্কার দিয়ে আক্রমণ করছে। সে বেশ কয়েকটি ভেড়ার বাচ্চাকে হত্যা করে তাদের খাবারে পরিণত করে। সিংহ মাতা তার সন্তানের বীরত্ব দেখে 'বাহ্ বাহ্' দিয়ে উঠে।

গল্পটির শিক্ষা:

প্রিয় ভাই! আমরা মুসলিম, আমরা বীরের জাতি, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করিনা, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পরোয়া করি না, আর কাউকে ভয় করিনা, বুলেট-বোমা, জেল-জুলুম কিংবা জালিমের রক্তচক্ষু আমাদেরকে সত্য মানতে ও দুনিয়ার বুকে তা প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দিতে পারে না। এইতো আমাদের পরিচয় ছিল। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ আমাদের অবস্থা সেই হারিয়ে যাওয়া কিংবা নিজেকে 'ভেড়ার বাচ্চা' ভাবা সেই সিংহশাবকের ন্যায়। আমাদের যিন্দেগী আর আমাদের পূর্ববর্তী সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী আর অন্যান্য সালাফ ও আকাবীরগণের যিন্দেগী মিলিয়ে দেখি। আমাদের যিন্দেগী কি একই রকম? তাদের সীরাত মানেই বীরত্ব আর শৌর্য-বীর্যের উপাখ্যান। আমাদের যিন্দেগীগুলো কাপুরুষতার বিভীষিকায় ছেয়ে আছে। কাপুরুষতার অভিশাপে আমরা ব্যধিগ্রস্ত। হায়! অথচ আমরা তাদের রূহানী সন্তান যাদের নাম শুনলে কিসরা-কায়সারের সাম্রাজ্যগুলোতে কাঁপন ধরত। যাদের নাম নিয়ে ভয় দেখিয়ে বাচ্চাদেরকে কুফ্ফার জননীরা তাদের বাচ্চাদের ঘুম পাড়াত। যাদের ভয়ে কুফ্ফার সেনাপতিরা সবসময় দৌঁড়ের উপর থাকত। যাদের ভয়ে কুফ্ফাররা তাদের কাপড় নষ্ট করে ফেলত। যাদের আতঙ্কে তারা কখনো আমাদের মা-বোনদের দিকে চোখ তুলে তাকাবারও সাহস পেত না।

হায়! আজ আমরা কোটি কোটি মুসলমান বর্তমান রয়েছি। অথচ আমরা আজ বানে ভেসে আসা খড়-কুটোর মতো মূল্যহীন। প্রতিটি ভূমি থেকে আজ আমরা উৎখাত হচ্ছি। গণহত্যা আর নির্যাতনের শিকার হচ্ছি। মা-বোনদের ইজ্জত আর সম্ভ্রমের হেফাজত করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। এগুলো কেন হচ্ছে ভাই? কারণ আমরা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছি। মৃত্যুর ভয়ে আমরা কাপুরুষতার যিন্দেগী বরণ করে নিয়েছি। আমরা আমাদের আত্মপরিচয় ভুলে গিয়েছি। সুতরাং প্রিয় ভাই! আসুন আমরা আমাদের রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, সালাফ/আকাবীরগণ, পূর্বপুরুষ বাপ-দাদাদের বীরত্ব দেখি, নিজেদেরকে তাদের উত্তরসূরি হিসেবে নতুন করে আবিষ্কার করি এবং বীরত্বের সে খুনরাঙা পথে পা বাড়াই। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করেন। আমীন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্ভীকতা ও বীরত্ব:

- বীরত্ব ও বাহাদুরির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্থান ছিল সকলের উপরে। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। কঠিন পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট বীর পুরুষদের যখন পদস্খলন হয়ে যেত, তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতেন। তিনি সে সুকঠিন সময়েও পশ্চাদপসরণ না করে সামনে অগ্রসর হতেন। তাঁর দৃঢ়চিত্ততায় এতটুকু বিচলিত ভাবও আসত না।

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লহ আনহুমা বলেছেন,

مَا رَأَيْتُ أَشْجَعَ وَلَا أَنْجَدَ وَلَا أَجْوَدَ ولا أرضى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা না কোনো বীর, সরল ও উদারপ্রাণ ব্যক্তি দেখেছি এবং না অন্যান্য চরিত্র গুণেও তাঁর চাইতে পছন্দনীয় কাউকে দেখেছি।" (নশরুত্তীব) [https://shamela.ws/book/23645/225#p3]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إِنَّا كُنَّا إِذَا حَمِيَ الْبَأْسُ- وَيُرْوَى اشْتَدَّ الْبَأْسُ- وَاحْمَرَّتِ الحدق، اتقينا برسول الله صلّى الله عليه وسلم فَمَا يَكُونُ أَحَدٌ أَقْرَب إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا

"যে সময় যুদ্ধের বিভীষিকা দেখা যেত এবং সুকঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, সে সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ছত্র ছায়ায় আশ্রয় নিতাম। কারণ, তখন তিনিই থাকতেন কাফেরদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। বদর যুদ্ধে আমরা তাঁর আড়ালে আশ্রয় নিতাম। তাঁর চেয়ে বেশি দৃঢ়তার সাথে অন্য কেউ শত্রুর মোকাবিলা করতে পারতো না।" (শাফী, কাজী আয়ায, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৯) [https://shamela.ws/book/২3645/২২৫#p4]

হুনাইনের যুদ্ধের দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক দুঃসাহসী, বীর ও নির্ভীক কাউকে দেখা যায়নি। (মাদারেজুন্নবুওয়ত) এভাবে প্রতিটি যুদ্ধে তিনি ﷺ-ই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"আমাকে অন্য লোকের উপর চার বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে: দানশীলতা, বীরত্ব, পৌরুষশক্তি ও বিপক্ষের উপর প্রাধান্য। তিনি নবুয়তের পূর্বে এবং নবী থাকা কালেও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।" (নশরুত্তীব)

- একদিন কুরাইশ প্রধানগণ কাবা ঘরের হাতিমের ভিতরে বসে গল্প করছিলো। তারা পরস্পর বলাবলি করছিলো, 'মুহাম্মাদ ﷺ এর ব্যাপারে আমরা যতখানি ধৈর্য ধারণ করেছি, ইতিপূর্বে আর কারো জন্য তা করতে হয়নি। আমাদের সে মূর্খ নির্বোধ বলে। আমাদের পূর্বপুরুষদের সে মন্দ বলে। আমাদের ধর্মের সমালোচনা করে। আমাদের ঐক্যের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেছে। আমরা এই সববিছু সহ্য করেছি।' এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা প্রাঙ্গণে এসে হাজরে আসওয়াদ পাথরকে চুম্বন করলেন। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে শুরু করলেন। তাওয়াফের সময় কুরাইশদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তারা নবীজী ﷺ-কে কটুকথা বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগলো।

নবীজী ﷺ-এর পবিত্র চেহারায় তাদের বিদ্রুপের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেলো। তিনি কাউকে কিছু না বলে তাওয়াফ করতে লাগলেন। দ্বিতীয়বার তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রমকালে তারা আবারো বিদ্রুপ করলো। এবারো নবীজী ﷺ চুপচাপ সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। তৃতীয়বারও তারা নবীজী -ﷺকে কটু কথা বললে তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন,

أتسمعون يا معشر القريش، أما والذى نفس محمد بيدة لقد جئتكم بذبح

"হে কুরাইশের দল, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ঐ সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমি মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে জবাই করতে এসেছি।"

নবীজী ﷺ-এর মুখে এমন কঠোর কথা শুনে কাফেররা ভয় পেয়ে গেলো। তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, হে আবুল কাসেম, আপনি চলে যান। আল্লাহর কসম! আপনি তো অন্যদের মতো নির্বোধ লোক নন।

নবীজী ﷺ সেখান থেকে চলে গেলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩২০)

- একরাতে অজানা একটি আওয়াযে মদীনা বাসীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। সবাই আওয়ায অনুসরণ করে ছুটতে লাগল। পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে দেখা হল। সকলেই বুঝলেন, তিনিই ﷺ সবার আগে সে আওয়াযের উৎস জানতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। নবীজী ﷺ কোলাহল লক্ষ্য করে অগ্রসর হলেন। সে সময় তিনি হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘোড়ার খালি পিঠে সওয়ার হয়ে ছিলেন। তাঁর ﷺ গলায় তরবারি ঝুলানো ছিল। তিনি ﷺ লোকদের বলছিলেন, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। (সহীহ মুসলিম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.২৫২)

- একদিন প্রচণ্ড রোদ থেকে ফিরে তিনি একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। ক্লান্তির দরুন তিনি নিদ্রায় ঢলে পড়লেন। তাঁর তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখেছিলেন গাছের ডালে। এক লোক এসে তরবারিটি হাতে নিয়ে কোষমুক্ত করে চিৎকার করে বলল, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? নবীজী ﷺ শান্ত কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ! লোকটির হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল। তিনি ﷺ তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, এবার তোমাকে কে আমার হাত হতে রক্ষা করবে? লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি তরবারির সদ্ব্যবহার করো। তিনি ﷺ লোকটিকে ছেড়ে দিলেন।

- উহুদ যুদ্ধের পরের ঘটনা। আবু সুফিয়ান (তখনও তিনি মুসলমান হননি) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বদরের প্রান্তরে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের আহ্বান করেন। নবীজী ﷺ তার এই আহ্বানকে সানন্দে গ্রহণ করেন। এদিকে আবু সুফিয়ান কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বলেন, তিনি সৈন্য পাঠানোর আগে মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে চান। তিনি এ লক্ষ্যে ইহুদীদের হাত করেন এবং দ্বিগুণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে তাদেরকে মদীনায় পাঠান। তাদের দায়িত্ব ছিল, মদীনায় গিয়ে এই গুজব ছড়ানো যে, কুরাইশরা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে বদরে আসছে, যা ইতোপূর্বে মুসলমানরা দেখেনি। মদীনার মুসলমানরা এই গুজবকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। ফলে তাদের চেহারায় এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত এই গুজব এবং তাতে সাহাবায়ে কেরামের ভীতির কথা নবীজী ﷺ-এর পবিত্র দরবারে পৌঁছলে, তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

والذي نفسي بيده، لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد

(হে সাহাবীরা! তোমরা যদি মূর্তি-পূজারী মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে ভয় পেয়ে থাক, তাহলে শুনে নাও!) যে সত্তার হাতে আমি মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, কেউ না গেলেও আমি একাই তাদের মোকাবেলার জন্য বদরে যাবো।"

নবীজী ﷺ-এর এক কথাতেই সাহাবায়ে কেরামের মাঝে গোজবের প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। পরের দিনই মুসলমানরা বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ঐদিকে আবু সুফিয়ানও প্রথমে তার বাহিনী নিয়ে বের হয়েছিলেন, কিন্তু অজানা

ভীতির কারণে, মাঝপথ থেকে তিনি তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ না করেই মক্কায় পালিয়ে যান। (আল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ৩৮৭/১)

- হুনায়ন যুদ্ধের সময় কাফেররা অবিশ্রান্ত তীর বর্ষণ করে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একপ্রকার অস্থিরতা ও চিত্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে দিয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের অবস্থান একটুও পরিবর্তন করেননি। তিনি একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। কাফেররা সরাসরি তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তখন শত্রুপক্ষের এমন কেউ ছিল না, যার চোখে সে ধূলিকণা প্রবেশ করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন:

أنا النبي لا كذب– أنا ابن عبد المطلب

"আমি নবী; এতে সন্দেহ নেই। আমি বীর আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।"

সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক দুঃসাহসী, বীর ও নির্ভীক কাউকে দেখা যায়নি। (মাদারেজুন নবুওয়ত)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ ফরমান,

والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل

"সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জান! অবশ্যই আমি আশা করি: আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাব এবং এতে শহীদ হয়ে যাব, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হবো, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো।" (বুখারী-৩১২৩ এবং মুসলিম-১৮৭৬)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: وَلَوَدِدْتُ أَنِّيْ قُتِلْتُ فَيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ - البخاري، المشارع الأشواق ٦٦٥- ١٠٨٨

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুলাহ ﷺ ইরশাদ করেন- আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করে শহীদ হব। অতঃপর পুনরায় জীবিত করা হবে, আবার শহীদ হবো, আবার জীবিত করা হবে, আবার শহীদ হব, আবার জীবিত করা হবে আবার শহীদ হব। (সহীহ বুখারী, মাশারিউল আশওয়াক্ব)

সাহাবায়ে কেরামের নির্ভীকতা ও বীরত্ব:

֍ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্ভীকতা ও বীরত্ব:

- হযরত আলী রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর ছিলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। বদর যুদ্ধের দিন যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি ছাপড়া তৈরি করলাম তখন আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কে থাকবে? যাতে কোনো মুশরিক তাঁর দিকে আসতে না পারে? আল্লাহর কসম, তখন কেউই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থাকার সাহস করে নাই, একমাত্র হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুই ছিলেন, যিনি খোলা তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার নিকট দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন কোনো দুশমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করত, তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ইনিই হলেন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বীর ও বাহাদুর ব্যক্তি। (মাজমা)

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিহাদী জযবা:

- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর প্রথম খলীফা নিযুক্ত হলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আশেপাশের মুনাফিকরা একত্রিত হতে লাগল। চারদিকে ইসলাম ত্যাগের হিড়িক পড়ে গেল। অবাধ্য, বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ফেতনা, ফাসাদ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল আনসার ও মুহাজির সাহাবীদেরকে একত্রিত করলেন। তাদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, "আরবের লোকেরা যাকাত স্বরূপ তাদের উট এবং বকরী দিতে অস্বীকার করেছে এবং তারা বলছে যে, ঐ ব্যক্তি (নবীজী ﷺ), যার কারণে তোমাদেরকে সাহায্য করা হতো, সে মৃত্যু বরণ করেছে। এখন তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, আমিও তো তোমাদের মতো একজন মানুষ।" হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমার মতামত হলো, তাদের থেকে নামায কবুল করা হোক এবং তাদের থেকে যাকাত মাফ করে দেয়া হোক। কেননা, তারা তো অজ্ঞতা যুগের কাছাকাছি। (অর্থাৎ নও মুসলিম।)" হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত লোকদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, সকলেই হযরত উমরের কথায় সন্তুষ্ট। তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ স্থান হতে দাঁড়ালেন এবং মিম্বরে আরোহন করলেন। প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলেন। অতঃপর তিনি সিংহের মতো গর্জে উঠলেন, নিজের ঈমানী চেতনা প্রকাশ করলেন এবং বললেন,

"হে লোক সকল! আমি সেই সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা' আলার একটি আদেশের জন্য জিহাদ করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন এবং আমাদের মধ্য থেকে জিহাদকারী জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যাবে এবং জান্নাতের হকদার হয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা খলিফা হয়ে জমিনের মালিক হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! এ লোকেরা (যাকাত অস্বীকারকারীরা) যদি একটি রশিও যা নবীজী ﷺ-এর যামানায় তারা দিত, আমাকে দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। যদিও তাদের পক্ষে বৃক্ষ, পাথর এবং সমগ্র জীন ও ইনসান লড়াই করে। আর এ যুদ্ধে আমার ডান হস্ত আমার সঙ্গ না দিলে বাম হস্ত দিয়েই (অর্থাৎ কেউ আমার সাথে না থাকলেও) আমি (একাই) তাদের (মুর্তাদদের) বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাবো।"

এ কথা শুনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জোরে তাকবীর দিয়ে উঠলেন, "আল্লাহু আকবার", "আল্লাহু আকবার"। অতঃপর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পেরেছি, একথা সত্য।" (হায়াতুস্ সাহাবাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৩-৭১)

ৠ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্ভীকতা ও বীরত্ব:

- ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজী ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি যে সকল মজলিসে কুফুরির অবস্থায় বসতাম, সে সকল মজলিসে আমার ঈমানকে অবশ্যই প্রকাশ করবো। তারপর তিনি দারুল আরকাম থেকে বেরিয়ে বাইতুল্লাহ

আসলেন এবং তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফ শেষে কুরাইশদের মজলিসে গেলেন। কুরাইশরা তার অপেক্ষাতেই ছিল। সেখানে তিনি সবার সামনে উচ্চস্বরে বললেন,

'اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَه' وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه' وَرَسُوْلُه

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

কুরাইশরা এই কালেমা শুনামাত্রই তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়লো। তিনি একাই সবার সাথে লড়াই করলেন এবং উতবাকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর চড়ে বসলেন। তারপর তাকে বেদম মারতে লাগলেন। তার চোখে এত জোরে আঘাত করলেন যে উতবা চিৎকার করা শুরু করলো। উতবাকে সেখানে ফেলে রেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং সেখান থেকে কুরাইশদের অন্য এক মজলিশে গেলেন। সেখানেও নিজের ঈমানকে প্রকাশ করে সেখানকার সর্দারকে পিটালেন। এভাবে কুরাইশদের প্রত্যেক মজলিশে গিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সর্দারদেরকে পিটিয়ে আসলেন এবং নিজের ঈমানকে প্রকাশ করে আসলেন। তারপর তিনি নবীজী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনার আর কোনো ভয় নেই।" তখন নবীজী ﷺ ঘর হতে বের হলেন। হযরত উমর ও হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর সম্মুখে চললেন, মুসলমানরাও পিছে পিছে চললেন। তারা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে সেখানে নামায আদায় করলেন।
তারপর সকলে যার যার ঘরে ফিরে গেলেন।

- হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মদীনায় হিজরতের সময় সকল সাহাবীই গোপনে হিজরত করেছেন। একমাত্র হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুই এমন ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে হিজরত করেন। তিনি যখন হিজরত করার ইচ্ছা করলেন তখন নিজের তলোয়ার গলায় বাঁধলেন এবং ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন এবং তীরদান হতে কয়েকটি তীর হাতে নিয়ে বাইতুল্লাহর নিকট আসলেন। কুরাইশদের কয়েকজন সর্দার সেখানে বসেছিল। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইতুল্লাহর সাত চক্কর তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের নিকট এসে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর মুশরিকদের একেকটি মজলিশের নিকট গিয়ে বললেন, এই সমস্ত চেহারা অপদস্ত হোক! (আমি হিজরত করার জন্য বের হয়েছি।) যে ব্যক্তি চায়, তার মা পুত্র-হারা হোক, তার সন্তানরা এতীম হোক আর তার স্ত্রী বিধবা হোক, সে যেন এই ময়দানের অপর পাশে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। (অতঃপর তিনি সেখান হতে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন) কুফ্ফারদের একজনও তার পিছু নিতে সাহস পায়নি। (মুন্তাখাবুল কানয)

֍ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্ভীকতা ও বীরত্ব:

- হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট এসে এ কবিতা আবৃত্তি করেন,

اَفَاطِمُ هَاكِ السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيْمِ - فَلَسْتُ بِرِعْدِيْدٍ وَلَا بِلَئِيْمِ

"হে ফাতিমা, দোষত্রুটিমুক্ত এই তরবারি নাও। (অর্থাৎ ইসলামের শত্রুনিধনে এই তলোয়ার কোনরূপ ত্রুটি করেনি।); আর না আমি ভয়ে প্রকম্পিত, আর না আমি হীন, না অহংকারী।" (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৬)

- খন্দকের যুদ্ধের দিন আমর ইবনে আব্দে উদ্দ যুদ্ধের জন্য পরিখা অতিক্রম করে মুসলমানরা যে পাশে ছিল সে পাশে চলে আসল এবং 'মোকাবেলার জন্য কে প্রস্তুত আছে?' বলে বলে চিৎকার করতে লাগল। সে ছিল বিশাল বপুধারী, দৈত্য সমতুল্য। ফলে আরবরা তাকে মানুষ নয়, অসুর শক্তির অধিকারী বলে মনে করত। এ কথা সবাইকে বলতে শুনা যায় যে, আমর শক্তিশালী ঘোড়াকে পর্যন্ত অতি সহজভাবে কাঁধে তুলতে পারে এবং পাঁচশ অশ্বারোহীকে সে একাই পরাজিত করতে পারে।

মুসলমানরা জানত, তার মোকাবেলা করা মানে 'আত্মহত্যার' শামিল। ফলে কেউ সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস পাচ্ছিল না। ইতোমধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি প্রস্তুত আছি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই ব্যক্তি আমর, বসে যাও।

এদিকে আমর হুঙ্কার দিয়েই যাচ্ছিল, মুসলমানদেরকে তিরস্কার করে বলতে লাগল, কোথায় তোমাদের সেই জান্নাত যার ব্যাপারে তোমাদের ধারণা যে, তোমাদের যে কেউ কতল হয় সে তাতে প্রবেশ করে? তোমরা আমার মোকাবেলায় কি কাউকে পাঠাতে পারো না?

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনবার অনুমতি চাইলেন, নবীজী ﷺ তিনবারই বললেন, সে আমর, বসে যাও। এবার আলী রাদিয়াল্লাহু বললেন, হোক না সে আমর (আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট)! অবশেষে রাসূল ﷺ তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে স্বীয় পাগড়ি মাথা হতে খোলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথায় স্বহস্তে বেঁধে দেন। নিজের তরবারিটিও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তুলে দেন। এসময় রাসূল ﷺ এর যবান মুবারক থেকে বের হয়ে যায়- "আলীর সাহায্যকারী একমাত্র তুমিই হে আল্লাহ।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে গেলেন। এসময় তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন-

لاَ تَعْجَلَنَّ فَقَدْ اَتَاكَ - مُجِيْبُ صَوْتِكَ غَيْرَ عَاجِزْ

তাড়াহুড়া করো না, তোমার ডাকে সাড়া দেওয়ার লোক চলে এসেছে, যে অক্ষম নয়।

فِيْ نِيَّةٍ وَبَصِيْرَةٍ - وَالصِّدْقِ مَنْجٰى كُلِّ فَائِزْ

সে বুঝেশুনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই এসেছে, সত্যই প্রত্যেক সফলকাম ব্যক্তির জন্য নাজাতের উপায়।

إِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ أَقِيْمَ - عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزْ

আমি পরিপূর্ণ আশা রাখি যে, মৃতদের জন্য বিলাপকারিনী মহিলাদেরকে তোমার উপর খাড়া করে দিব।

مِنْ ضَرْبَةٍ نَجْلَاءَ- يبقى ذكرُها عِنْدَ الْهَزَاهِزْ

আমি তোমার উপর তলোয়ারের এমন লম্বা চওড়া আঘাত করব যার আলোচনা বড় বড় যুদ্ধের সময় হতে থাকবে।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, সে প্রত্যাখ্যান করলো। আমর বলল, "হে আমার ভাতিজা, আমাকে মোকাবেলার জন্য তুমি কেন এসেছো? আল্লাহর কসম, আমি তো তোমাকে কতল করতে পছন্দ করি না।" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কতল করতে

ভালোবাসি। একথা শুনে আমর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে অগ্রসর হলো। উভয়ে আপন আপন সওয়ারী হতে নেমে পড়ল এবং একে অপরকে আক্রমণ করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে চক্কর দিতে লাগল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু চামড়ার ঢাল নিয়ে আমরের সামনে আসেন। আমর সেই ঢালের উপর তলোয়ারের এমন আঘাত হানল যে, ঢাল কেটে তরবারি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা পর্যন্ত পৌঁছল এবং মাথায় আঘাত লাগল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমরের কাঁধের উপর তরবারির এমন শক্তিশালী আঘাত করলেন যে সে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং এর ফলে ধুলা উড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি শুনে বুঝতে পারলেন যে, আমর নিহত হয়েছে। এভাবে অবশেষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে এই দৈত্যের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৭-২৫৮)

- খায়বারের যুদ্ধের দিন ইহুদী পালোয়ান মুরাহহাব স্বগর্বে আপন তরবারি নাড়িয়ে নাড়িয়ে বাহির হয়ে এলো এবং এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল-

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ اَنِّيْ م مرَحَّبُ
شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبْ
إِذَا الْحُرُوْبُ اَقْبَلَتْ تَلَهَّبْ

"সমস্ত খায়বার বাসী ভালো করে জানে,
আমি মুরাহহাব, অস্ত্রসজ্জিত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাহাদুর,
(আমার বাহাদুরী তখন দেখা যায়)
যুদ্ধের অগ্নিশিখা যখন প্রজ্জ্বলিত হয়।"

তাকে মোকাবেলা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম হযরত আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর নবীজী ﷺ বললেন, আজ আমি এমন এক ব্যক্তিকে ঝাণ্ডাদান করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে মহব্বত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিলেন। মুরাহহাব পূর্বের ন্যায় কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ময়দানে হুঙ্কার দিচ্ছিল।

তার মোকাবেলায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বাহির হয়ে আসলেন

اَنَا الَّذِيْ سَمَّتْنِيْ أُمِّي حَيْدَرَه - كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَه - أُوْفِيْهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَه

"আমি সেই ব্যক্তি, যার মা তার নাম রেখেছে হায়দার (আল্লাহর সিংহ)'
আমি জঙ্গলের বিভৎসদর্শন সিংহের ন্যায়।
আমি দুশমনকে পরিপূর্ণ মাপ দিব,
যেমন প্রশস্ত দাড়িপাল্লায় পূর্ণরূপে মেপে দেয়া হয়।
(অর্থাৎ অতিমাত্রায় শত্রুনিধন করবো।)"

অতঃপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারির এমন আঘাত হানলেন যে, মালাউন মুরাহহাবের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে তাকে হত্যা করে ফেললেন।

খায়বারের যুদ্ধের দিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দূর্গের দরজা তুলে ধরলেন। মুসলমানরা সেই দরজার উপর আরোহন করে দূর্গের ভিতর প্রবেশ করলেন এবং দূর্গ জয় করলেন। পরবর্তীতে সেই দরজা উত্তোলন করতে চল্লিশ জন (আরেক বর্ণনায় সত্তর জন লোক) প্রয়োজন হয়েছিল। (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৯-২৬৪)

ꙮ হযরত যুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্ভীকতা ও বীরত্ব:

- ইসলামের ইতিহাসে হযরত যুবাইর মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরবারীই সর্বপ্রথম তরবারী যা আল্লাহর খাতিরে ক্রোধান্বিত হয়ে উত্তোলিত হয়েছিল।

তখন তাঁর বয়স মাত্র বার বছর। একদিন দুপুরবেলা তিনি কাইলুলাহ অর্থাৎ বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন, মক্কার কেউ নবীজী ﷺ-কে শহীদ করে দিয়েছে। এই আওয়াজ শুনামাত্রই তিনি খোলা তরবারি হাতে বের হয়ে গেলেন। পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সামনা সামনি দেখা হয়ে গেল। নবীজী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, হে যুবায়ের, তোমার কী হয়েছে? তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি শুনতে পেয়েছি, আপনাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। নবীজী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী ইচ্ছা করেছিলে? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত মক্কাবাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। তখন নবীজী ﷺ তার জন্য ও তাঁর তরবারির জন্য দোয়া করলেন। (মুন্তাখাবে কানয, হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৮)

- ওহুদের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের ঝাণ্ডাবহনকারী তালহা বিন আবি তালহা আবদারী মুসলমানদেরকে তার মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানাল। প্রথমতঃ মুসলমানরা তার সাথে মোকাবেলা করতে ঘাবড়িয়ে গেলেন। এদিকে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মোকাবেলার জন্য বের হলেন এবং এক লাফে তালহার উটের উপর উঠে তার সাথে যেয়ে বসলেন। উটের উপরই লড়াই আরম্ভ হলো। হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তালহাকে উটের পিঠ হতে মাটিতে ফেলে দিয়ে আপন তরবারি দ্বারা জবাই করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, প্রত্যেক নবীর জন্য (জীবন উৎসর্গকারী) হাওয়ারী (সাহায্যকারী) থাকে। আর আমার হাওয়ারী হলো যুবাইর। তিনি আরো বলেন, যেহেতু আমি দেখেছি, লোকেরা তালহা আবদারীর মোকাবেলায় পিছু হটছে, সেহেতু যদি যুবাইর তার মোকাবেলার জন্য না যেত তবে আমিই স্বয়ং যেতাম। (বিদায়াহ, হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৮)

- ইবনে ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন যে, নওফল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুগীরাহ মাখযূমী খন্দকের যুদ্ধের দিন শত্রুদের কাতার হতে বের হয়ে মুসলমানদেরকে তার মোকাবিলার জন্য আহ্বান জানাল। তার মোকাবিলার জন্য হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু বের হয়ে আসলেন। এরপর তিনি তরবারি দ্বারা এমন আঘাত করলেন যে, তাকে দুই টুকরা করে দিলেন। উল্লেখ্য, এই আঘাতের দরুন তার তরবারির ধার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৯)

- ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আপনি যদি কাফেরদের উপর হামলা করতেন, তাহলে আমরাও আপনার সাথে কাফেরদের উপর হামলা করতাম। হযরত যুবাইর

রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি যদি হামলা করি তবে তোমরা তোমাদের কথা রক্ষা করতে পারবে না। তাঁরা বললেন, আমরা এমনটি করবো না। (বরং আমরা আপনার সাথেই থাকব।) তারপর হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফেরদের উপর এমন জোরদার হামলা করলেন যে, তাদের কাতার ভেদ করে অপরদিকে বের হয়ে গেলেন অথচ সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কেউই তার সঙ্গে ছিলেন না। তিনি পুনরায় শত্রুর কাতার ভেদ করে ফিরে আসার সময় কাফেররা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে তাঁর কাঁধের উপর তরবারীর দুটি আঘাত করলেন, যা তাঁর বদরযুদ্ধে লাগা আঘাতের ডানে বামে দুই দিকে লাগল।

হযরত ওরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ছোটসময়ে সেই সমস্ত জখমের গর্তগুলোতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।

আলবিদায়ার রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবা (রাঃ) দ্বিতীয়বার হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পূর্বের ন্যায় অনুরোধ জানালে তিনি প্রথমবারের মত আবার একইভাবে আক্রমণ করে দেখালেন।

(হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭০-২৭২)

ꙮ হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব:

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেজাযের রাবেগ এলাকার দিকে এক জামাত প্রেরণ করেন। উক্ত জামাতে হযরত হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ। মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেদিন হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু আপন তীর দ্বারা মুসলমানদের হেফাযত করেছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় তিনিই সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। আর এই যুদ্ধই ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিল। (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭২)

ওহুদ যুদ্ধে একই তীরে তিন কাফেরকে হত্যা করা:

এটি এভাবে হয়েছিল যে, দুশমনরা তার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলে তিনি সেই তীর কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং একজনকে হত্যা করলেন। কাফেররা সেই তীর পুনরায় তার প্রতি নিক্ষেপ করলে তিনি আবার তীরটিকে কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করে দ্বিতীয় আরেকজন কাফেরকে হত্যা করেন। কাফেররা পুনরায় সেই তীর তাঁর প্রতি তৃতীয়বারের মত নিক্ষেপ করলে তিনিও পুনরায় সেই তীর কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করে তৃতীয় আরেক কাফেরকে হত্যা করলেন। হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই কৃতিত্বে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই তীর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে উঠিয়ে দিয়েছেন। সেইদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّيْ

'আমার পিতা-মাতা তোমার উপর কোরবান হইক।'

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কখনও সওয়ার হয়ে আবার কখনও পদাতিকভাবে যুদ্ধ করেছেন। অথবা অর্থ এই যে, তিনি তো পদাতিকই ছিলেন, কিন্তু আরোহী যোদ্ধার ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধ করেছেন। (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭২-২৭৩)

꧁ হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব:

বদর যুদ্ধের দিন হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু উটপাখির পালক দ্বারা নিশান লাগিয়ে নিয়েছিলেন।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমাইয়া ইবনে খালাফ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বদরের দিন বুকের উপর উটপাখির পালক দ্বারা নিশান লাগানো ব্যক্তিটি কে ছিল? আমি বললাম, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচা হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। তিনিই তো আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করেছেন। (বাযযার, হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৩)

꧁ হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব:

তায়েফের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হানযালা ইবনে রাবী' রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তায়েফবাসীদের নিকট পাঠালেন। তিনি তায়েফবাসীদের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন। তারা হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধরে দূর্গের ভিতর নিয়ে যেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে আছে যে হানযালাকে এদের নিকট থেকে উদ্ধার করে আনতে পারে? যে তাকে উদ্ধার করে আনতে পারবে সে আমাদের এই যুদ্ধের সওয়াবের ন্যায় পূর্ণ সওয়াব লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই এরশাদ শুনে একমাত্র হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠলেন। তায়েফের লোকেরা হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে দূর্গের ভিতরে প্রবেশ করার উপক্রম হল। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের নিকট পৌঁছে গেলেন। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তিনি হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিজের কোলে উঠিয়ে নিলেন। তায়েফের লোকেরা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর দূর্গের উপর হতে পাথর বর্ষণ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জন্য দোয়া করতে লাগলেন। অবশেষে হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পৌঁছে গেলেন। (কানয, হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৯)

꧁ হযরত মুআয ইবনে আমর ও মুআয ইবনে আফরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নির্ভীকতা ও বীরত্ব: আবু জেহেলের হত্যাকাণ্ড

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি যুদ্ধের কাতারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি দেখলাম, আমার ডানে ও বামে অল্পবয়স্ক দুইজন আনসারী বালক দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে খেয়াল আসল, যদি আমার পাশে দুইজন শক্তিশালী পুরুষ থাকতো (তবে কতই না ভালো হতো)! হঠাৎ তাদের একজন আমার হাত ধরে চুপিসারে বললো, চাচাজান, আপনি কি আবু জেহেলকে চিনেন?

আমি বললাম, হ্যা, চিনি। তাকে দিয়ে তোমার কী প্রয়োজন?

সে বলল, আমি শুনেছি, সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে গালাগালি করে। সেই পাক যাতের কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি তাকে দেখতে পাই, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট থেকে আমি পৃথক হবো না, যতক্ষণ না আমাদের উভয়ের মাঝে একজনের মৃত্যু হয়।

আমি তার মুখে বীরত্ব ব্যঞ্জক এমন কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম।

এমন সময় দ্বিতীয়জনও আমার হাত ধরে চুপিসারে একই প্রশ্ন করলো এবং প্রথমজন যা বলেছিল, দ্বিতীয়জনও তা-ই বলল। ইতিমধ্যে আবু জেহেলকে দেখলাম ময়দানে লোকদের মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের উভয়কে বললাম, ঐ যে তোমাদের শিকার, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। একথা শুনামাত্র উভয় আনসার বালক ক্ষুধার্ত বাজপাখির মতো আবু জেহেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তার উপর তরবারি চালাতে লাগলেন। অবশেষে তাকে কতল করে ফেললেন। এরপর তাঁরা উভয়ে নবীজী ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে সংবাদ দিলেন।

নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কে আবু জেহেলকে হত্যা করেছ? প্রত্যেকেই বললেন, আমি তাকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি তোমাদের নিজ নিজ তরবারি মুছে ফেলেছ? তারা বললেন, না। অতঃপর তিনি তাদের উভয়ের তরবারি দেখে বললেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছো। এরপর তিনি আবু জেহেলের সামানপত্র হযরত মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রদান করলেন। অপরজন হযরত মুআয ইবনে আফরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন।

মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু জেহেল কাফেরদের তীর-তলোয়ারের দুর্ভেদ্য পাহারার মাঝে অবস্থান করছিল। কাফেররা বলছিল, আবু জেহেলের কাছে কেউ যেন ঘেষতে না পারে। একথা শুনে আমি তার কাছাকাছি অবস্থান করতে লাগলাম এবং তাকেই আমার একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিলাম এবং আবু জেহেলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলাম।

যখন সে আমার আয়ত্তের ভিতর আসল, তখন তার উপর আক্রমণ করলাম এবং এমনভাবে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করলাম যে, তার পায়ের অর্ধেক হাঁটুর নিচ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঝরে পড়া খেজুরের ন্যায় তার পা উড়ে গেল। এদিকে আবু জেহেলকে আমি আঘাত করলাম আর অন্যদিকে তার পুত্র ইকরামা আমার হাতে আঘাত করলো। এতে যুদ্ধ করতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল। আমি তখন হাতের কাটা অংশ পায়ের নীচে রেখে এক ঝটকায় হাত থেকে আলাদা করে ফেললাম। এরপর আবু জেহেলের নিকট মুআয ইবনে আফরা উপনীত হলেন। তিনি ছিলেন আহত। তিনি আবু জেহেলের উপর এমন আঘাত করলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন সেখানেই ঢলে পড়লো। আবু জেহেলের শেষ নিঃশ্বাস তখনো বের হয়নি। শ্বাস-প্রশ্বাস তখনও চলছিল।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নবীজী ﷺ বললেন, আবু জেহেলের পরিণাম কে দেখবে, দেখে আস। সাহাবারা তখন আবু জেহেলের সন্ধান করতে লাগলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জেহেলকে এমতাবস্থায় পেলেন যে, তার নিঃশ্বাস তখনও চলাচল করছিল। তিনি আবু জেহেলের ধড়ে পা রেখে মাথা কাটার জন্য দাঁড়ি ধরে বললেন, ওরে আল্লাহর দুশমন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তোকে অপমান অপদস্ত করলেন তো? আবু জেহেল বললো, কিভাবে আমাকে অসম্মান

করলেন? তোমরা যাকে হত্যা করেছ তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আর কোনো মানুষ আছে নাকি? আহ! আমাকে কিশোর ছাড়া অন্য কেউ যদি হত্যা করতো!

এরপর বলতে লাগল, আজ কারা বিজয়ী হয়েছে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জেহেলের কাঁধে পা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। আবু জেহেল তাকে বলল, ওরে বকরির রাখাল! তুই অনেক উঁচু স্থানে পৌঁছে গিয়েছিস। উল্লেখ্য, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় বকরি চরাতেন।

এ কথোপকথনের পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জেহেলের মাথা কেটে নবীজী ﷺ-এর সামনে হাজির করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ হচ্ছে আল্লাহর দুশমন আবু জেহেলের মাথা। নবী করীম ﷺ বললেন, "হ্যাঁ সত্য, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হ্যাঁ সত্য, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হ্যাঁ সত্য, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ তা'আলা সুমহান। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে নিবেদিত, তিনি তাঁর ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। নিজের বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং একাকীই সকল দলকে পরাজিত করেছেন।" (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৯-২৮১)

֍ হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহ্ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বীরত্ব

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি তরবারি সাহাবায়ে কেরামের সামনে পেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, কে এই তরবারির হক আদায় করতে পারবে? হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এর হক আদায় করব। কিন্তু এর হক কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, এর হক হচ্ছে তুমি এটি দ্বারা কোনো মুসলমানকে হত্যা করবে না আর তুমি এটি নিয়ে কোনো কাফের থেকে পলায়ন করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই তরবারিটি হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রদান করলেন। হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ করার পূর্বে মাথায় লাল পট্টি বেঁধে নিতেন। যদিও এটি এক প্রকারের অহংকারের নিদর্শন, কিন্তু যুদ্ধের ময়দানের জন্য এতে কোনো দোষ নেই। তাঁর লাল পট্টি বাঁধা দেখে আনসারগণ বলতেন, আবু দুজানা মৃত্যুর পট্টি বেধেঁ নিয়েছে।

যাইহোক, হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি আজ আবু দুজানাকে দেখব, তিনি কী করেন। সুতরাং দেখলাম, তার সম্মুখে যে কাফেরই পড়ত, তাকেই তিনি লাঞ্ছিত করে ছাড়তেন এবং দ্বিখণ্ডিত করে ফেলছিলেন। (বিদায়াহ, হাকেম)

মুশরিকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে আমাদের আহতদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করছিল। হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও এই মুশরিক উভয়ে একে অপরের নিকটবর্তী হতে লাগল। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ করতে লাগলাম যেন তাদের উভয়ের মাঝে মোকাবিলা হয়। তারা উভয়ে মুখোমুখী হল এবং উভয়ে একে অপরের উপর তরবারি চালালো। মুশরিক হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর তরবারি দ্বারা আঘাত করলে তা হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঢাল দ্বারা প্রতিহত করলেন এবং নিজেকে বাঁচালেন। আর মুশরিকের তরবারি হযরত

আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঢালে আটকে গেল। অতঃপর হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারির আঘাতে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত কা‘ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমিও মুসলমানদের সাথে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যখন মুশরিকদেরকে দেখলাম, তারা মুসলমানদেরকে শহীদ করে দিয়ে তাদের নাক কান কেটে দিচ্ছে তখন দাঁড়িয়ে গেলাম। মুসলমানদের লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অস্ত্রধারী এক মুশরিককে বলতে শুনলাম, সে বলছে, হে মুসলমানগণ, তোমরা (কতল হওয়ার জন্য) একত্রিত হও যেমন বকরীর দল (জবাই হওয়ার জন্য) একত্রিত হয়। হযরত কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অপরদিকে একজন অস্ত্রধারী মুসলমান সেই মুশরিকের অপেক্ষা করছিলেন। আমি অগ্রসর হয়ে সেই মুসলমানের পিছনে পৌঁছে গেলাম এবং দাঁড়িয়ে মুসলমান ও কাফের উভয়ের ব্যাপারে অনুমান করতে লাগলাম। সুতরাং আমার মনে হল, কাফেরের নিকট অস্ত্র ও যুদ্ধের প্রস্তুতি বেশি। আমি উভয়ের মুকাবিলার অপক্ষোয় রইলাম। অবশেষে তারা উভয়ে মুখোমুখী হল এবং মুসলমান ব্যক্তিকে দেখলাম, এমন জোরে কাফেরের কাঁধের উপর তরবারি দ্বারা আঘাত করলেন যে, কাফের কোমরের নিচ পর্যন্ত চিরে দুই টুকরা হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর সেই মুসলমান ব্যক্তি নিজ চেহারা হতে নেকাব সরিয়ে বলল, হে কা‘ব, কেমন দেখলে! আমি আবু দুজানা। (হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড ২, পৃ. ২৮২-২৮৭)

֍ হযরত কাতাদাহ ইবনে নো’মান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বীরত্ব

হযরত কাতাদাহ ইবনে নো’মান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ধনুক হাদিয়া স্বরূপ পেলেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন তিনি সেই ধনুক আমাকে প্রদান করলেন। আমি সেই ধনুক দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে দাঁড়িয়ে এত পরিমান তীর নিক্ষেপ করলাম যে, ধনুকের মাথা ভেঙ্গে গেল। আমি অনড়ভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারা মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং নিজ চেহারার উপর তীরের আঘাত লইতে লাগলাম। যখনই কোনো তীর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারা মুবারকের নিকট আসত তখনই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারা রক্ষা করার জন্য নিজের মাথা ঘুরিয়ে তীরের সামনে তুলে ধরতাম। (আর আমার ধনুক ভেঙে যাওয়ার দরুন) আমি নিজে কোন তীর নিক্ষেপ করতে পারছিলাম না। অবশেষে একটি তীর এসে এমনভাবে লাগল যে, আমার চোখের পুতলি খুলে হাতের উপর এসে পড়ল। আমি তাকে হাতের তালুতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে হাজির হলাম। আমার হাতে চোখের পুতলি দেখে তাঁর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল এবং তিনি আমার জন্য এই দুআ করলেন, হে আল্লাহ! কাতাদাহ আপন চেহারা দ্বারা আপনার নবীর চেহারা রক্ষা করেছে, অতএব তার চোখকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সর্বাধিক তীক্ষ্ণ করে দিন। সুতরাং তাঁর সেই চোখ অপর চোখ অপেক্ষা বেশি সুন্দর ও অধিক তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। (তাবারানী)

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারা মুবারকের হেফাজত করছিলাম। আর হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খরাশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ পিঠ মুবারক দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিঠ মুবারকের হেফাযত করছিলেন। হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিঠ সেদিন তীর দ্বারা ভরে গিয়েছিল। আর এই ঘটনা ওহুদের যুদ্ধের দিন ঘটেছিল। (হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড ২, পৃ. ২৮৭-২৮৮)

࿐ হযরত বারা ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বীরত্ব

ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মুসলমানগণ ধীরে ধীরে মুশরিকদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে মুশরিকদেরকে একটি বাগানের ভিতর আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন। উক্ত বাগানের ভিতর আল্লাহর দুশমন (ভণ্ডনবী) মুসাইলামাতুল কায্যাবও অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় হযরত বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে মুসলমানগণ! আমাকে দেয়ালের উপর দিয়ে উঠিয়ে দুশমনদের মাঝে ফেলে দাও। তিনি একটি ঢালের উপর বসে বললেন, তোমরা আমাকে বর্শা দ্বারা উঠিয়ে মুশরিকদের ভিতর ফেলে দাও। অতঃপর তাকে ধরে দেয়ালের উপর উঠানো হল। যখন তিনি বাগানের দেয়ালের উপর উঠলেন তখন তিনি নিজেকে বাগানের ভিতর ফেলে দিলেন এবং বাগানের ভিতর দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে মুসলমানদের জন্য বাগানের দরজা খুলে দিলেন। মুসলমানরা বাগানের ভিতর ঢুকে পড়লেন, আর আল্লাহ তা'আলা মুসাইলামাকে কতল করিয়ে দিলেন। এদিকে মুসলমানরা বাগানে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি ইতিমধ্যে দশজন মুশরিককে কতল করে ফেলেছেন। (ইবনে ইসহাক, বাইহাকী)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, হযরত বারা ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যেন মুসলমানদের কোনো জামাতের আমীর বানানো না হয়। কেননা, তিনি স্বয়ং এক ধ্বংস (নিজের জানের পরওয়া করেন না। মুসলিমদের আমীর হয়ে তাদেরকেও এমন স্থানে নিয়ে যাবেন যেখানে বিপদের আশংকা বেশি হবে।) (মুন্তাখাবে কানয) [হায়াতুস্ সাহাবাহ্, খণ্ড ২, পৃ. ২৯৮-৩০০]

࿐ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বীরত্ব

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ইয়ামামার যুদ্ধের দিন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে অত্যন্ত জোরে মুসলমানদেরকে এই বলে আওয়াজ দিতে দেখেছি যে, হে মুসলমানগণ, তোমরা জান্নাত হতে পলায়ন করছ? আমি আম্মার ইবনে ইয়াসির, আমার দিকে আস। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাকে দেখেছি যে, তার কান কেটে গিয়েছিল এবং তা নড়ছিল। এমতাবস্থায় তিনি পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। [হায়াতুস্ সাহাবাহ্, খণ্ড ২, পৃ. ৩০৩-৩০৪]

࿐ হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব যুবাইদী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বীরত্ব

হযরত মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ খাছআমী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ঐ ব্যক্তি হতে সম্মানী ব্যক্তি আর দেখি নাই, যিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের পক্ষ হতে ময়দানে বের হয়ে আসলে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী অনারব কাফের তার মুকাবিলার জন্য আসল। তিনি তাকে কতল করে দিলেন। তারপর কাফেররা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে লাগল। তিনি কাফেরদেরকে পিছন দিক হতে ধাওয়া করলেন। অতঃপর তিনি পশমের তৈরি একটি বিরাট তাঁবুতে প্রবেশ করে বড় বড় (খাবারের) পেয়ালা আনালেন এবং আশেপাশের সকল মুসলমানদেরকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। (অর্থাৎ তিনি যেমন বীর তেমনি দানশীলও ছিলেন।) বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনি কে ছিলেন? হযরত মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তিনি হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন।

হযরত কায়েস ইবনে আবি হাযেম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন। হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের কাতারের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতেন আর বলতেন, হে মুহাজিরবৃন্দ! তোমরা শক্তিধর সিংহের মত হয়ে যাও। (এমন প্রচণ্ড হামলা কর যেন বিপক্ষের আরোহী সৈন্য তার বর্শা ফেলে দিতে বাধ্য হয়।) কারণ আরোহী সৈন্য যখন তার বর্শা ফেলে দেয় তখন সে নিরাশ হয়ে যায়। এমন সময় একজন পারস্য সর্দার তার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করল যা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধনুকের মাথায় লাগল। তিনি পাল্টা তার উপর বর্শা দ্বারা এমন আঘাত করলেন যে, তার কোমর ভেঙ্গে গেল। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সওয়ারী হতে নেমে সেই সর্দারের সামানপত্র নিয়ে নিলেন।

ইবনে আসাকির রহ. এই ঘটনাকে আরো দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন। এর শেষাংশে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, হঠাৎ একটি তীর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিনের অগ্রভাগে এসে লাগল। তিনি তীর নিক্ষেপকারীর উপর আক্রমণ করলেন এবং তাকে এমনভাবে ধরলেন যেমন মানুষ ছোট মেয়েকে ধরে থাকে। অতঃপর (মুসলমান ও কাফের) উভয় পক্ষের কাতারের মাঝখানে শুইয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন এবং আপন সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন, এইভাবে কর। (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনদেরকে এইভাবে ধরে জবাই কর।)

ওয়াকেদী রহ. এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা খাইয়াত রহ. বলেন, কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একাই দুশমনের উপর আক্রমন করে বসেন এবং তাদের উপর অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তরবারি চালনা করতে লাগলেন। তারপর মুসলমানরাও তার কাছে পৌঁছে গেলেন এবং দেখলেন যে, দুশমনরা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চতুর্দিক হতে ঘিরে রেখেছে, আর তিনি একাই কাফেরদের উপর তরবারি চালাচ্ছেন। মুসলমানরা সেই কাফেরদেরকে হযরত আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট হতে সরিয়ে দিলেন।

তাবারানীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সালাম জুমাহী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখেন যে, আমি তোমার সাহায্যের জন্য দুই হাজার লোক পাঠাচ্ছি। একজন হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অপর জন হযরত তালহা ইবনে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। (অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকে এক এক হাজারের সমান।)

হযরত আবু সালেহ ইবনে ওজীহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হিজরী একুশ সনে নেহাওয়ান্দের যুদ্ধে হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হওয়ার পর প্রথমতঃ মুসলমানদের পরাজয় হল। পরে হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন জোরদার লড়াই করলেন যে, পরাজয় বিজয়ে পরিবর্তন হয়ে গেল। আর তিনিও মারাত্মকভাবে আহত হলেন। অবশেষে রুযা নামক গ্রামে তার ইন্তেকাল হল। (এসাবাহ), [হায়াতুস্ সাহাবাহ্, খণ্ড ২, পৃ. ৩০৬-৩০৭]

ৠ হযরত আবু মেহজান সাকাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বীরত্ব

হযরত আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রায়ই শরাব পান করার জন্য চাবুকাঘাত করা হত। যখন অত্যধিক পরিমাণে শরাব পান করতে লাগলেন তখন মুসলমানরা তাকে বেঁধে বন্দী করে রাখেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন তিনি (বন্দী অবস্থায়) কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁর মনে হল মুশরিকরা মুসলমানদের বিরাট ক্ষতি সাধন করে যাচ্ছে। তিনি মুসলমানদের আমীর হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাঁদী অথবা স্ত্রীর নিকট এই মর্মে খবর পাঠালেন যে, আবু মেহজান বলছেন যে, তাকে বন্দীখান হতে মুক্ত করে একটি ঘোড়া ও হাতিয়ার দেয়া হোক। তিনি দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করবেন। যুদ্ধশেষে তিনি সকল মুসলমানদের পূর্বে ফিরে আসবেন, তখন তাকে আবার বন্দীখানায় বেধে রেখো। অবশ্য যদি আবু মেহজান সেখানে শহীদ হয়ে যায় তবে ভিন্ন কথা।
অতঃপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন-

كَفى حزنا أن تلتقى الخيل بالقنا ـ وأترك مشدودا على وثاقيا

"দুঃখ ও বেদনার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, ঘোড় সওয়ার তো বর্শা দ্বারা যুদ্ধ করছে আর আমাকে বেড়ী পরিয়ে বন্দীখানায় আবদ্ধ রাখা হয়েছে।"

إذا قمت عنانى الحديد وغلقت ـ مصارع دونى قد تصم المناديا

"যখন আমি দাঁড়াই তখন লোহার শিকল আমার পা আটকিয়ে রাখে, আর আমার শহীদ হওয়ার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং আমার পক্ষ হতে আহ্বানকারীকে বধির করে দেয়া হয়েছে।"

বাঁদী যেয়ে হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রীকে বিষয়টি জানাল। হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী তার শিকল খুলে দিলেন এবং তাকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রও দিলেন। হযরত আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়া ছুটিয়ে বের হলেন এবং মুসলমানদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি যে কোনো দুশমনের উপর আক্রমণ করতেন তাকে কতল করে দিতেন এবং তার কোমর ভেঙ্গে ফেলতেন। তিনি উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলে হামলা করছিলেন। তিনি যেদিকেই হামলা করতেন, আল্লাহ তা'আলা সেদিকের মুশরিকদেরকে পরাজিত করে দিচ্ছিলেন। তার প্রচণ্ড হামলা দেখে মুসলমানরা বলাবলি করতে লাগলেন যে, এই ব্যক্তিকে তো কোনো ফেরেশতা মনে হচ্ছে।
হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাকে দেখলেন তখন খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, এই অশ্বারোহী কে? অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে পরাজিত করলেন। হযরত আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে অস্ত্রপাতি ফেরত দিলেন এবং নিজের পায়ে নিজেই শিকল পরে নিলেন।
হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন যুদ্ধশেষে নিজের অবস্থানের জায়গায় ফিরে আসলেন, তখন তাঁর স্ত্রী অথবা তাঁর বাঁদী জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের যুদ্ধ কেমন হল? হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিস্তারিতভাবে যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে বললেন, আমরা পরাজিত হতে যাচ্ছিলাম, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা সাদাকালো বর্ণের ঘোড়ার পিঠে একজন ঘোড়সওয়ার পাঠালেন। যদি আমি আবু মেহজানকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় না রেখে যেতাম তবে আমি নিশ্চিত বলতাম যে, এটি আবু মেহজানেরেই কৃতিত্ব। তাঁর স্ত্রী বললেন, তিনি আবু মেহজানই ছিলেন। অতঃপর তিনি আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা বিস্তারিতভাবে তাঁকে শুনালেন।

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে তার সমস্ত শিকল খুলে দিলেন এবং বললেন, (আজ যেহেতু তোমার কারণে মুসলমানদের পরাজয় বিজয়ে পরিবর্তন হয়েছে সেহেতু) আগামীতে তোমাকে আর কখনও শরাব পান করার উপর চাবুক মারব না। হযরত আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম, আমিও আগামীতে আর কখনও শরাব পান করব না। এতদিন আপনার চাবুক মারার কারণেই আমি শরাব পরিত্যাগ করা পছন্দ করতাম না। এরপর হযরত আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহু আর কখনও শরাব পান করেননি। (ইস্তিআব, এসাবাহ) [হায়াতুস্ সাহাবাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু খণ্ড ২, পৃ. ৩০০-৩০৩]

ৠ 'আল্লাহর তরবারি'র বীরত্ব:

অষ্টম হিজরি, মোতাবেক ৬২৯ ঈসায়ী। পূর্ব রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ মুসলিম ফৌজ। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রথম যুদ্ধ। নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবদ্দশায় রোমানদের বিরুদ্ধে একমাত্র যুদ্ধ। একদিকে দুই লক্ষ খ্রিস্টান সেনা, অপরদিকে মাত্র তিন হাজার মুসলিম যোদ্ধা। খ্রিস্টান বাহিনীর প্রথম আঘাতেই শহীদ হয়ে যান মুসলিম বাহিনীর প্রথম সেনাপতি হযরত যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু। এরপর শহীদ হয়ে যান দ্বিতীয় কমান্ডার হযরত যাফর বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। অতঃপর শহীদ হয়ে যান তৃতীয় কমান্ডার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুও।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এই তিনজনকেই কমান্ডার হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকের শাহাদাতে সৃষ্টি হয় নেতৃত্বের শূন্যতা। মুসলিম ফৌজ দাঁড়িয়ে যায় খাদের কিনারায়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে দ্রুত মুসলিম বাহিনীর পতাকা তুলে নেন হযরত সাবিত বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু। এক মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে তিনি পতাকা তুলে দেন দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এক যোদ্ধার দিকে আর বলেন, হে ওয়ালিদের পুত্র! আপনি আমাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

হযরত সাবিত বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে নেতৃত্বের প্রস্তাব দিলেন, তিনি সবেমাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এর আগে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে কোনো যুদ্ধেই অংশ নেননি তিনি। বরং একাধিক যুদ্ধে কুফুরি শক্তির পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছেন ইসলামের বিপক্ষে। নওমুসলিম ঐ ব্যক্তি সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "আমি সবেমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আমি কী করে আল্লাহর নবীর এত এত বিশ্বস্ত সাহাবীর উপর নেতৃত্ব দিতে পারি? এ আমার কাছে এক স্পর্ধার বিষয়।" সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "ওহে সুলাইমানের পিতা! এ ময়দানে আপনার চাইতে যোগ্য কোনো যোদ্ধা নেই। অযথা সময় নষ্ট না করে পতাকা হাতে তুলে নিন, আর বিপর্যস্ত মুসলিম বাহিনীর উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন।" নিরুপায় হয়ে মুসলিম ফৌজকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইসলাম ধর্মে নবদিক্ষিত এই ব্যক্তি।

নতুন কমান্ডার দায়িত্ব নেয়ার পর বদলে যায় যুদ্ধের দৃশ্য। মাত্র তিন হাজার রণক্লান্ত মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন দুই লক্ষ রোমান সৈন্যের উপর। যুদ্ধক্ষেত্রের গোটা অগ্রভাগে ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম বাহিনী আর রচনা করে প্রচণ্ড আক্রমণ। অপ্রতিরোদ্ধ তরঙ্গের ন্যায় তারা আছড়ে পড়ে বিশাল এক বাহিনীর উপর।

পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা মুসলিম বাহিনীর হঠাৎ এই তীব্র আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়ে শত্রুপক্ষ। তারা বুঝতেই পারে না মুসলিম বাহিনী হঠাৎ এতটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে কিসের শক্তিতে! তাদের বিস্ময়ের ঘোর কেটে উঠার আগেই যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে দেন নতুন এই মুসলিম কমান্ডার। তার আক্রমণ এতটাই প্রচণ্ড ছিল যে, আঘাতের ধকল সইতে না পেরে তাঁর হাতে থাকা তলোয়ারটি ভেঙে যায়। তিনি আরেকটি তলোয়ার হাতে নেন। আর একই তীব্রতায় শত্রুর উপর আঘাত করেন। দ্বিতীয় তলোয়ারটিও ভেঙে যায়। তিনি আরেকটি তলোয়ার হাতে তুলে নেন। তৃতীয় তলোয়ারটিও ভেঙে যায়। এরপর তিনি আরেকটি তলোয়ার হাতে নেন। এভাবে একে একে নয়টি তলোয়ার ভেঙে তিনি যখন দশম তলোয়ারটি হাতে তুলে নিয়েছেন, ততক্ষণে রোমান বাহিনীর হুশ ফিরেছে। তারা উপলব্ধি করে এই নতুন কমান্ডারকে মোকাবেলা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো তলোয়ার যেমন তার হাতে অক্ষত থাকার সামর্থ রাখে রাখে না, তেমনি কোনো প্রতিপক্ষও তার সামনে অক্ষত থাকতে পারে না। নিশ্চিত মৃত্যু এড়াতে পিছু হটতে বাধ্য হয় খ্রিস্টান রোমান বাহিনী। ভয়াবহ এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ছিল- মাত্র বারজন মুসলিম সৈন্য শাহাদাত লাভ করেন, অন্যদিকে কুফ্ফারদের হতাহতের সংখ্যা ছিল সীমাহীন। আর তা আমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি এই নতুন কমান্ডারের হাতে নয়টি তরবারি ভাঙ্গার কাহিনী থেকে।

জর্ডানের মুতায় সংগঠিত এই যুদ্ধই ছিল ইসলামের ছায়াতলে তাঁর প্রথম যুদ্ধ। মুসলিম বাহিনীর পরাজয় এড়িয়ে যুদ্ধের ফলাফল অমীমাংসিত রেখে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আর এভাবেই এক অমীমাংসিত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে এক অজেয় সেনাপতির। ইসলামের ছায়াতলে আবির্ভূত হন এক অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধা। সত্য দ্বীনের বিজয়যাত্রায় পদার্পন ঘটে আরেক মহানায়কের। ইতিহাসে সূচনা ঘটে আরেকটি নতুন অধ্যায়ের।

মদীনায় ফিরে গেলে তাঁর অভূতপূর্ব বীরত্ব আর সাহসের কথা জেনে নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর উপাধি দেন 'সাইফুল্লাহ্', তথা 'আল্লাহর তরবারি'। আল্লাহর এই তরবারি যতবার উন্মুক্ত হয়েছে, প্রতিপক্ষের ভাগ্যে পরাজয়, মৃত্যু আর পলায়ন ব্যতীত আর কিছুই জুটেনি। এই তরবারির সামনে বানের স্রোতের মত ভেসে যায় ভণ্ডনবীদের ফেতনা। এই তরবারির ঝলকানিতে ভস্ম হয়ে যায় হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করে আসা পারস্য সাম্রাজ্য। এই তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে দিশেহারা হয়ে রাজত্ব ছেড়ে ইউরোপে পালিয়ে যায় রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস। পারস্যের দুর্ভেদ্য শিকলের প্রাচীর আর রোমানদের লৌহ বর্ম সবকিছু খানখান হয়ে যায় এই একটি তরবারির আঘাতে। তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন একই সাথে শত্রুর বিনাশ আর নিজের শাহাদাতের তামান্না নিয়ে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো যোদ্ধার জন্ম হয়নি যে তাকে পরাস্ত করতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধার নাম হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। আরবের সংস্কৃতি অনুযায়ী আরবরা তাকে "ওয়ালিদের পুত্র" কিংবা "সুলাইমানের পিতা" বলে ডাকত। কিন্তু পৃথিবীবাসী তাঁকে চিনেছে "আল্লাহর তরবারি" হিসেবে।

তিনি ছিলেন এক অজেয় যোদ্ধা, অতুলনীয় মহাবীর। প্রতিটি যুদ্ধের শুরুতে দ্বৈত লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে তিনি এগিয়ে যেতেন। প্রতিপক্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা এগিয়ে আসলে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে খতম করতে সাধারণত এক মিনিটের বেশি সময় নিতেন না। ওয়ালাজার যুদ্ধে এক বিশালদেহী পারস্য সেনা দ্বৈত যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এসেছিল। পারসিয়ানরা অপেক্ষা করছিল খালিদের শেষ দেখার জন্য। কেননা তারা জানত এই পারস্য সেনা

একাই এক হাজার পুরুষের শক্তি ধারণ করে। তারা তার নাম দিয়েছিল "হাজার মর্দ"। লড়াই শুরু হওয়ার আগে পার্সিয়ানরা উল্লাস করতে থাকে। কিন্তু কয়েক মিনিটের ব্যবধানে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করেন। সেদিন সেই "হাজার মর্দের" স্পন্দনহীন বুকের উপর বসে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দুপুরের খাবার খেয়েছিলেন। আর বিস্ময়াভিভূত পারসিয়ানদের দিকে তাকিয়ে তিনি মিটিমিটি হেসেছিলেন।

এই যুদ্ধের কয়েক বছর পর হিমসের যুদ্ধে অনুরূপ এক বিশাল দেহের অধিকারী জেনারেল খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তবে সে পার্সিয়ান ছিল না, সে ছিল রোমান সেনাপতি। সে সিংহের মত গর্জন করতে থাকে আর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে তেড়ে আসে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বশক্তি দিয়ে তার বর্ম পরিহিত মস্তকের উপর আঘাত হানেন। আল্লাহর তরবারির আঘাতে দুই টুকরা হয়ে যায় লোহার বর্ম। অতঃপর তলোয়ার ফেলে দিয়ে প্রতিপক্ষকে দুই হাত দিয়ে নিজের বুকের সাথে নির্দয়ভাবে চেপে ধরেন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। রোমান সেনাপতির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় আর থেমে যায় তার গর্জন। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশ্য তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে রোমান ঐ সেনাপতির পাজরের হাড় ভেঙে গিয়েছে এবং তা মাংস ভেদ করে বাহিরে বের হয়ে এসেছে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন অপরাজেয় সেনাপতি। তার সমগ্র জীবনে প্রায় একশত আটটি যুদ্ধ তিনি করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানরা কখনো পরাজয়ের মুখ দেখেননি। ভণ্ডনবী তুলায়হা থেকে শুরু করে মিথ্যাবাদী মুসায়লামা, পারস্যের এক লক্ষ দিরহামের মুকুট পরিহিত সেনাপতি হরমুয থেকে শুরু করে রোমান সর্বাধিনায়ক মাহান, সমকালের সব সেরা যোদ্ধা, সব সেরা কমান্ডার, রাজা-মহারাজা, রথি-মহারথি, সম্রাট-মহাসম্রাটদের কাছে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এক মূর্তমান আতঙ্কের নাম। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘোড়া দাপিয়ে বেড়িয়েছে বুজাখার সমতল ভূমি থেকে ইয়ামামার বিশাল প্রান্তর, কুয়েতের কাজিমা থেকে শুরু করে ইরাকের হীরা, আনবার থেকে শুরু করে পারস্যের শেষ দুর্গ ফিরোজ, ফিলিস্তিনের আজনাদাইন থেকে শুরু করে জর্দানের ফাহল, সিরিয়ার দামেস্ক থেকে শুরু করে ইমেসা, ইয়ারমুক, আলেপ্পো, একের পর এক দুর্গ, একের পর এক শহর, একের পর এক সাম্রাজ্য হাঁটু গেড়ে বসেছিল তার সামনে। ন্যায়ের পতাকাধারী মুসলিম ফৌজের অগ্রযাত্রায় যেখানেই বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, সেখানেই নিজের রুদ্রমূর্তি দেখিয়েছেন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। দোযখের তাণ্ডব চালিয়েছেন পারস্যের ওয়ালাজায়, রক্তের স্রোত বইয়েছেন খোরাসানের কাশাফ নদীতে। পারস্যের দর্প চূর্ণ করে তিনি যখন রোমান সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন, সেদিন নয় হাজার যোদ্ধাকে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে তিনি পাড়ি জমান একশ বিশ মাইল পানিশূন্য মরুভূমি, যা ইতিহাসে আর কেউ কখনো করে দেখানোর সাহস পায়নি। হিরাক্লিয়াসের মত মহাসম্রাট, যিনি নিজের অতুলনীয় যোগ্যতা আর দক্ষতা দিয়ে ভেঙে যাওয়া রোমান সাম্রাজ্যকে পুনরায় একত্র করেছিলেন, তিনি সিরিয়া ছেড়ে কন্সট্যান্টিনোপল পালিয়ে গিয়েছিলেন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে।

এককথায়, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ইসলামের সেই তরবারির নাম যা কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে চিরদিন খোলা থাকে, কখনো খাপবদ্ধ হয়না। আলহামদুলিল্লাহ! ইসলাম এমন এক ধর্ম যা একসাথে, অতি

ক্ষুদ্র সময়ে মানবেতিহাসের সবচেয়ে চৌকষ, বহু সমরনায়কের জন্ম দিয়েছে যাদের অবদানে ইসলামের আলো স্বল্প সময়ে দূর-দূরান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অন্যতম। তার রণকৌশল, তুখোর নেতৃত্ব, সমরপ্রজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতীত্ব, বিচক্ষণতা এবং বীরত্ব, সবই ছিল অসাধারণ, ইতিহাসে অতুলনীয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই তরবারির হাতে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য তছনছ করে দেন। তিনি কুফ্ফার বাহিনীর সামনে হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন, انا فارس الضديد

انا خالد بن الوليد

"আমি মহান যোদ্ধা,

আমি খালিদ বিন ওয়ালিদ।"

তিনি কাফেরদের জন্য সাক্ষাত যমদূত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোনো কোনো যুদ্ধে প্রায় লক্ষাধিক কাফেরকে একসাথে কোনোরূপ ভিসা ছাড়াই সরাসরি জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। যেমন: ফিহলের যুদ্ধে প্রায় আশি হাজার কাফেরকে হত্যা করা হয়, ইয়ারমুকের যুদ্ধে প্রায় সত্তর হাজার (মতান্তরে একলক্ষ বিশ হাজার) কাফেরকে হত্যা করা হয়, বুআইবের যুদ্ধে প্রায় দেড় লাখ কাফেরকে হত্যা করা হয়, তাঁর নির্দেশে কাশাফ নদীতে প্রায় সত্তর হাজার কাফেরকে গলা কেটে হত্যা করে রক্তের নদী প্রবাহিত করা হয়। তিনি এজন্য এত পরিমাণ কাফের নিধন করেছিলেন যে, এই কুফ্ফাররা এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আবারো নতুন করে সংগঠিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আরেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। তাই তিনি কুফ্ফারদের মূল কর্তন করে দিতে চেয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন যুদ্ধ-প্রেমী। যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। নারীর মোহ কিংবা দুনিয়ার মহব্বত তাঁকে কোনো দিনই আকৃষ্ট করেনি, এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন পাথরসম নিস্পৃহ। তিনি বলতেন, "বাসর রাত, কিংবা যে রাতে আমাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তা আমার নিকট সেই কনকনে শীতের রাতের চেয়ে অধিক প্রিয় নয়, যে রাতে আমি মুহাজিরদের সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

তিনি তাঁর সমস্ত যিন্দেগী কাটিয়েছেন রণাঙ্গনে। ইসলামের জন্য তিনি তার যিন্দেগীকে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তাঁর এক বন্ধুকে তিনি নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "আমার শরীরের এমন কোনো স্থান তুমি কি দেখেছ যেখানে তীর, তরবারি কিংবা বর্শার ক্ষত নেই?" তাঁর বন্ধু শরীরের এমন কোনো স্থান খুঁজে পাননি যেখানে কোনো ক্ষতচিহ্ন ছিল না। তাঁর বন্ধু অবাক বিস্ময়ে তাঁর শরীরের সবখানের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। "তুমি কি জান আমি কত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি?" বন্ধুকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এরপরও আমি শহীদ হলাম না কেন? লড়াই করতে করতে আমার মৃত্যু হল না কেন? আহ! আমি এক বৃদ্ধ উটের মত মরছি। শয্যায় মারা যাওয়া আমার জন্য লজ্জাজনক। আল্লাহ তা'আলা ভীরু কাপুরুষদের চোখে ঘুম না দেন!" "আপনি যুদ্ধের ময়দানে নিহত হতে পারেন না, আবু সুলাইমান!" বন্ধুবর তাকে আশ্বস্ত করে জানান, "আপনাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'সাইফুল্লাহ' তথা 'আল্লাহর তরবারি' আখ্যা দিয়েছেন। এটা নবীজীর ভবিষ্যদ্বানী ছিল যে, আপনি যুদ্ধের ময়দানে মারা যাবেন না। যদি আপনি রণক্ষেত্রে মারা যেতেন, তাহলে সবাই বলতো যে, 'এক কাফের আল্লাহর তরবারি ভেঙ্গে ফেলেছে।' অথচ এমনটি হতে পারে না।....আপনি ইসলামের নাঙ্গা তলোয়ার ছিলেন।" এরপর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন। (হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এর জীবনী "আল্লাহর তলোয়ার"- মেজর জেনারেল এ আই আকরাম, লিংক- https://archive.org/details/KhalidbinwalidRa)

নারী সাহাবীদের নির্ভীকতা ও জিহাদ প্রেম:

প্রিয় ভাই! কেবল পুরুষ সাহাবীগণই ইতিহাসে বীরত্বের সাক্ষর রেখেছেন এমনটি নয়। বরং নারী সাহাবীগণও সৃষ্টি করেছেন জিহাদ প্রেমের অতুলনীয় ইতিহাস। চলুন, এরকম কয়েকজন নারী সাহাবীর ঘটনাও শুনা যাক।

֍ হযরত ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহার নির্ভীকতা ও জিহাদপ্রেম:

কে সেই সেরা বুদ্ধিমতী নারী, পুরুষরা যার কারণে হাজার রকম হিসাবনিকাশ করতে বাধ্য হতো?
কে সেই নির্ভীক সাহাবিয়া, যিনি ছিলেন সর্বপ্রথম এক মুশরিক হত্যাকারিণীর গৌরবে ভূষিত?
কে সেই বিচক্ষণ মহিলা, যিনি সৃষ্টি করেন আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তরবারির খাপমুক্তকরণের ইতিহাস?
তিনিই হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মানিতা ফুপু, আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা, হযরত ছফিয়্যাহ হাশেমী ও কুরাইশী রাদিয়াল্লহু আনহা।

চলুন দেখি, তিনি ওহুদের ময়দানে কী করলেন?

"জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"র উদ্দেশ্যে ওহুদের যুদ্ধে তিনি ছোট্ট একটি মহিলা দল নিয়ে মুসলিম সৈনিকদের সাথে যোগ দেন। সেখানে তিনি আত্মনিয়োগ করেন পানির ব্যবস্থাপনায়, তৃষ্ণার্ত মুজাহিদদের পানি পান করিয়ে তৃপ্ত ও উজ্জীবিত করলেন, তীর চেঁছে তীক্ষ্ম করলেন, ত্রুটিপূর্ণ ধনুক মেরামত করলেন।

তিনি যখন দেখতে পেলেন অল্প কয়েকজন ছাড়া মুসলিম বাহিনীর সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একা ফেলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে.....

এবং দেখতে পেলেন মুশরিকরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর কাছাকাছি এবং প্রায় তাঁর উপর আক্রমনে উদ্যত, তখন তিনি হাতের পানির পাত্রটি ছুঁড়ে ফেললেন জমিনের উপর আর আক্রান্ত শাবকের 'মা সিংহী'র মতো লাফিয়ে উঠলেন, ছিনিয়ে নিলেন এক পরাজিত সৈনিকের বর্শা, তা দিয়ে সৈনিকদের সারি ভেদ করতে করতে ছুটে চললেন, বর্শার তীক্ষ্ম ফলা দিয়ে এদিক-ওদিক আঘাত করতে লাগলেন, মুসলিম সৈনিকদের লক্ষ্য করে গর্জে উঠলেন "আরে ও কাপুরুষের দল! আল্লাহর রাসূলকে ফেলে পালাতে চাও? নিজেদের জান বাঁচাতে চাও?"

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখলেন, তাঁর আশঙ্কা হলো যে, তিনি (ছফিয়্যাহ) তাঁর মৃত ভাই হযরত হামযা রাদিয়াল্লহু আনহুর লাশ দেখে ফেলবেন, মুশরিক বাহিনী অত্যন্ত কুৎসিতরূপে যার বিকৃতি ঘটিয়েছে। তাই তাঁর পুত্র হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবীজী ﷺ বললেন,

-মাকে ফিরাও যুবাইর, তাড়াতাড়ি.....

যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন,

মা, থামো, মা এদিকে এসো।

-সরে যা, খবরদার মা মা করবি না।

-আল্লাহর রাসূল ঐ দিকে যেতে নিষেধ করেছেন।

-কিন্তু কেন? আমি তো জানি আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে।

তাঁর এ কুরবানি আল্লাহর জন্য।.....

এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, যেতে দাও।
যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পথ ছেড়ে দিলেন।
যুদ্ধ শেষ হলে হযরত ছফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর আপন ভাই (নবীজী ﷺ-র আপন চাচা) হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিকৃত লাশ দেখে বললেন-
এ সবই আল্লাহর খাতিরে হয়েছে। আমার কোনো অসন্তুষ্টি নেই। আল্লাহর ফয়সালায় আমি তুষ্ট। সম্পূর্ণ সমর্পিত। আল্লাহর কসম। আমি সবর করবো। আমি মনে করবো এ বিপদ আল্লাহর দ্বীনের জন্য এবং সে কারণে এর পূর্ণ প্রতিদান আমি অবশ্যই পাবো। ইনশাআল্লাহ।

এবার দেখি, খন্দকের যুদ্ধে তিনি কী ঘটালেন?

খন্দকের যুদ্ধে তাঁর অবস্থান, সে তো বীরত্ব গাঁথা এক রুদ্ধশ্বাস কাহিনী, যার পরতে পরতে তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রস্ফূটিত, সাহসিকতা ও সঙ্কল্প প্রকাশিত.....
তাহলে চলুন, কান পেতে শুনি ইতিহাসের সেই বিখ্যাত কাহিনি.....
রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলে নারী ও শিশুদের সুরক্ষিত দুর্গে রেখে যাওয়া ছিল তাঁর অভ্যাস। কেননা, প্রহরীদের অবর্তমানে কোনো বিশ্বাসঘাতক মদীনার ওপর আক্রমণ করে বসতে পারে। এবারও তিনি তাই করলেন। মুসলমানরা যখন খন্দকের আশপাশে কুরাইশ ও তার মিত্রদের মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করছিলেন, নারী ও শিশুদের শত্রুর আক্রমন নিয়ে ভাবার সুযোগ তাদের ছিল না। মদীনার সীমান্তবর্তী এলাকায় ছিল পরিখা আর মদীনার ভিতরে একটি দূর্গের অভ্যন্তরে অবস্থান করছিল নারী ও শিশুরা ।
আর এদিকে মদীনার ভিতরে কিন্তু দূর্গের বাহিরে অবস্থান করছিল বনু কুরাইযার ইহুদী সম্প্রদায়। এদের সাথে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি ছিল।
তখন ফযরের অন্ধকার। হযরত ছাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, এক ব্যক্তি দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে, দুর্গের চারপাশে উঁকিঝুকি করছে, আঁড়ি পেতে শুনতে চাচ্ছে কারা আছে এর ভিতরে.....
হযরত ছাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বুঝে ফেললেন, নিশ্চয়ই এ লোক ইহুদী, কেননা মদীনায় এখন ইহুদী ছাড়া আর কেউ নেই। নিশ্চয়ই এর সাথে আরো লোক আছে। তাহলে নিশ্চয়ই এরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছে। কুরাইশদের সাথে হাত মিলিয়েছে। নিশ্চয়ই এরা এখন জানতে এসেছে, এখানে আক্রমন প্রতিরোধকারী পুরুষ মানুষ আছে, না শুধু নারী আর শিশু অবস্থান করছে। এ মুহূর্তে এরা যদি আমাদের উপর আক্রমন করে তাহলে তা ঠেকানোর জন্য কোনো একজন মুসলিম পুরুষ আমাদের পাশে নেই।....
এ অবস্থায় আল্লাহর ওই দুশমন যদি আমাদের প্রকৃত পরিস্থিতির খবর তার কওমের কাছে পৌঁছাতে সফল হয়, তাহলে ইহুদীরা নারীদের করবে বন্দী-বাঁদী আর শিশুদের বানাবে দাস-দাসী, সেটা হবে মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ বিপদ ও বিপর্যয়ের কারণ।.....
এসব ভেবে তিনি নিজের ওড়না খুলে জড়ালেন মাথায়। কোমরে শক্ত করে গামছা বেঁধে কাঁধে তুলে নিলেন একটি বড় লৌহদণ্ড। নেমে এলেন দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে। খুব ধীরে ও সাবধানে সেখানে তৈরি করলেন একটি ছিদ্র।

সেই ছিদ্রপথ দিয়েই আল্লাহর দুশমনকে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টিতে। একসময় তিনি লোকটির অবস্থান দেখে নিশ্চিত হলেন। এবার তার উপর চূড়ান্ত আক্রমন চালানো সম্ভব.....

নিশ্চিত হয়েই চালিয়ে দিলেন চরম হামলা। সর্বশক্তি দিয়ে লৌহদণ্ডের আঘাত হানলেন তার মাথায়। একদম নির্ভুল নিশানা। এমন ভয়াবহ আঘাত সহ্য করা ছিল অসম্ভব। লোকটি ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।....

অবিলম্বে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঘাত হেনে তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন.....

প্রাণহীন নিথর দেহের কাছে নেমে এলেন দ্রুত। নিজের সঙ্গে রাখা ছুরি দিয়ে মাথা কেটে দেহ থেকে আলাদা করে ফেললেন। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটি দুর্গের উঁচু স্থান থেকে ছুঁড়ে মারলেন নিচের দিকে.....

ঢাল বেয়ে সেটি গড়াতে গড়াতে গিয়ে থামল সেই ইহুদীদের সামনে, যারা অপেক্ষা করছিল ওই সঙ্গীর সবুজ সংকেতের....

তারা সঙ্গী ইহুদীর কর্তিত মস্তক দেখে পরস্পর বলাবলি করতে থাকল,

আরে এটা আমরা নিশ্চিতরূপেই জানতাম, মুহাম্মাদ কখনোই নারী ও শিশুদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করে যাবার মানুষ নয়.....

এখন তো নিজের চোখেই দেখলাম....

এসব বলতে বলতে তারা ফিরে গেল নিজেদের গন্তব্যে।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! বলুনতো, ইতিহাসের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ড যখন ঘটালেন, তখন হযরত ছাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স কত ছিল?

ষাট বছর........(!!!)

কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই হত্যাকাণ্ডটি, একটু চিন্তা করুন! আল্লাহ তা'আলাই ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাযতকারী! সেদিনের এই হত্যাকাণ্ডটি না ঘটলে হয়ত আজ আমি, আপনি মুসলমান হতে পারতাম না। ইহুদীরা যদি নারী শিশুদের আক্রমন করতো, মুসলমানদের মনোবল ভেঙে যেত, মদীনার বাহির এবং ভিতর দু'দিক দিয়ে আক্রমনের শিকার হয়ে মুসলমান জাতি ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে পারতো!

আল্লাহ তা'আলা তাঁর আপন শান অনুযায়ী নবীজী ﷺ-এর ফুপু আম্মাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

[সুওয়ারুম মিন হায়াতিস্ সাহাবিয়্যাত, ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা]

꩜ হযরত নাসিবাহ আল্ মাযেনিয়া (উম্মে উমারা) রাদিয়াল্লাহু আনহার নির্ভীকতা ও জিহাদপ্রেম:

তিনি ছিলেন সেই দুইজন আনসারী সাহাবিয়্যাহর অন্তর্ভূক্ত, যারা আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের দিন বাহাত্তর জন পুরুষের পাশাপাশি নবীজী ﷺ-এর কাছে বাইয়াত হন।

বাইয়াত শেষে হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফিরে এলেন মদীনায়, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সম্মান বুকে নিয়ে.....

বাইয়াতের শর্তসমূহ পূরণ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে.......

এরপর পেরিয়ে গেল বহু সময়, বহু দিন ও মাস.......

তারপর একদিন এসে গেল ওহুদের যুদ্ধ। সে যুদ্ধে হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার রয়েছে এক বিরাট ভূমিকা, আহ্! কী যে উজ্জ্বল ও সমুন্নত সে কাহিনী!!! তাঁর বীরত্বের কাহিনী শুনলে পুরুষের পৌরুষত্বও লজ্জা পায়!!! হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওহুদের উদ্দেশ্যে বের হলেন নিজের পানির পাত্রটি নিয়ে, উদ্দেশ্য তাঁর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের তৃষ্ণা নিবারণ করা। আরও নিয়েছেন যখমের একগুচ্ছ পট্টি (ব্যান্ডেজের প্যাকেট)...... আশ্চর্যের কিছু নেই! কেননা, ময়দানে থাকবেন তাঁর স্বামী আর কলিজার তিনটি অংশ-

এক অংশ হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আর অপর অংশ হলো তাঁর দুই পুত্র হাবীব ও আব্দুল্লাহ......

তাছাড়া আল্লাহর দ্বীন হেফাযতের জন্য দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী অন্যান্য মুসলমান ভাইয়েরাও তাঁর প্রিয় মানুষ। ওহুদের যুদ্ধে ঘটে গেল যা ঘটার ছিল......

হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের দুচোখে দেখলেন, কীভাবে মুসলিম বাহিনীর সুনিশ্চিত বিজয় 'মহা বিপর্যয়ে' রূপান্তরিত হয়ে গেল.....

তিনি দেখলেন কিভাবে মুসলিম বাহিনীর কাতারে হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ল এবং একের পর এক তাঁদের লাশ পড়তে থাকল......

চলুন না, এই ভয়াবহ কঠিন মুহূর্তের বর্ণনার ভার ছেড়ে দেই খোদ হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওপর, কারণ তিনিই পারবেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওই সময়ের সঠিক বিবরণ দিতে। তিনি বলেন-

"খুব সকালে আমি ওহুদের ময়দানে গেলাম, আমার হাতে ছিল একটি পানির মশক, যা থেকে আমি মুজাহিদ ভাইদের পানি পান করাব।

একসময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছাকাছি পৌঁছলাম। শক্তি, বিজয় ও সাহায্যের পাল্লা তখন তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের দিকে ঝুঁকে ছিল.....

একটু পরেই মুসলিম বাহিনী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো, ফলে তিনি পড়ে রইলেন সামান্য কয়েকজনের প্রহরার মধ্যে যাঁদের সংখ্যা দশের উপরে নয়.....

ফলে আমি, আমার স্বামী ও পুত্র দ্রুত এগিয়ে গেলাম তাঁর নিকট.....

বালা যেমন কব্জিকে ঘিরে রাখে ঠিক তেমনি আমরা তাঁকে ঘিরে রাখলাম আর আমাদের সকল শক্তি ও অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর থেকে আক্রমন প্রতিরোধ করতে থাকলাম.....

মহানবী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন মুশরিকদের আক্রমন থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোনো ঢাল আমার কাছে নেই।

এরপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো পলায়নপর একজনের উপর যার হাতে ঢাল ছিল। তিনি তাকে ডেকে বললেন, "তোমার ঢালটি এমন কাউকে দিয়ে যাও যে লড়াই করছে।" লোকটি নিজের ঢাল ফেলে রেখে চলে গেল।

আমি সেটা তুলে নিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আক্রমন ঠেকাতে লাগলাম।

আমি প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতিরক্ষায় তরবারি চালিয়ে, তীর ছুঁড়ে আমার সর্বশক্তি ব্যয় করতে করতে এক পর্যায়ে অক্ষম হয়ে পড়লাম। আমার শরীরের গভীর ক্ষতগুলো আমাকে অপারগ করে দিল।

এমন এক কঠিন মুহূর্তে উত্তেজিত উটের মতো চিৎকার করে 'ইবনে কামিআ' বলতে লাগল, কোথায় মুহাম্মাদ? গেল কোথায়......

আমি আর মুছআব ইবনে উমায়ের আগলে দাঁড়ালাম তার পথ, তখন সে তরবারির আঘাতে মুছআবকে ভূপাতিত করলো, আরেক আঘাতে তাকে শহীদ করে ফেলল.....

এরপর ভয়াবহ আঘাত করলো আমার কাঁধে, যাতে সৃষ্টি হলো গভীর ক্ষত....

তারপরও আমি তার উপর উপর্যুপরি আঘাত করলাম, কিন্তু আল্লাহর দুশমনের গায়ে ছিল দুটি বর্ম......

যে মুহূর্তে আমার পুত্র রাসূলের ওপর থেকে অবিরাম আক্রমন প্রতিহত করে যাচ্ছিল হঠাৎ তাকে ভীষণ আঘাত করে বসল এক মুশরিক,

যাতে তাঁর বাহু কেটে বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হলো........

ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকল........

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম, সেখানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলাম।

কোমল সুরে তাঁকে বললাম 'আমার বেটা, আল্লাহর জন্য ওঠে পড়ো, আল্লাহর দুশমনদের খতম করতে এগিয়ে যাও....ওঠো বেটা....ওঠো....'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে ফিরে তাকালেন আর বললেন, 'তুমি যা করতে পারলে এমনটি আর কে পারবে হে উম্মে উমারা?'

এরপর সেখানে এগিয়ে আসতে লাগল সেই লোকটি যে আমার পুত্রকে আঘাত করেছিল, তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে বললেন, 'উম্মে উমারা, এই দেখো, এটাই তোমার পুত্রের ঘাতক।'

দৌঁড়ে আমি এক লাফে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করলাম তার পায়ের নলায়, ধপাস করে পড়ে গেল সে মাটিতে.....

আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। তরবারি ও বর্শার উপর্যুপরি আঘাতে তাকে শেষ করে দিলাম। প্রিয় নবী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি তো তার কেসাস নিয়ে ফেললে, উম্মে উমারা .....

আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি তোমাকে কেসাস গ্রহণে সফল করলেন....

তোমাকে নিজের চোখেই তার পতন দেখিয়ে দিলেন।'

*****

হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার দুই পুত্রের বীরত্বও কম ছিল না, তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীও পিতা-মাতার চেয়ে কোনো অংশে তুচ্ছ ছিল না.....

কারণ সন্তান তো পিতা-মাতার আদর্শই পেয়ে থাকে, তারা হয় মা-বাবারই দৃষ্টান্ত।

তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "ওহুদের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ময়দানে হাজির হয়েছিলাম। লোকেরা যখন তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে পড়ল, আমি আর আমার মা তাঁর নিকটবর্তী হলাম তাঁর উপর থেকে আক্রমন ঠেকাতে......

নবীজী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উম্মে উমারার পুত্র?

-হ্যাঁ।

-মারো, আঘাত করো......

তাঁর সামনে এক মুশরিককে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড শক্তিতে একটি পাথর নিক্ষেপ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে লোকটি পড়ে গেল, আমি পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে তার উপর পাথরের স্তূপ বানিয়ে ফেললাম। নবীজী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি দিলেন।

দৃষ্টি একটু ফিরাতেই তাঁর চোখে পড়ল আমার মায়ের কাঁধের যখম, সেখান থেকে ফোটায় ফোটায় রক্ত ঝরছিল। তিনি সচকিত হয়ে বললেন, 'তোমার মাকে দেখো...... তোমার মা....... ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও। আল্লাহ তোমাদের পরিবারের মধ্যে বরকত দান করুন....... তোমার মায়ের মর্যাদা অমুক অমুকের চেয়ে উর্ধ্বে........ আল্লাহ রহম করুন তোমাদের সকলের উপর।'

আমার মা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন-

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য এই দুআ করুন- আমরা যেন জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, 'ইয়া আল্লাহ, জান্নাতে ওদের আমার সঙ্গী বানিয়ে দাও'।

এই দুআ শুনে আমার মা বললেন, 'এরপর আমি আর কোনো কিছুরই পরোয়া করি না, দুনিয়াতে আমার যা হয় হোক। আমার কিছু যায় আসে না।'

উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওহুদের ময়দান থেকে গভীর ক্ষত আর তাঁর জন্য রাসূলের বিশেষ সেই দুআ নিয়ে ফিরে এলেন।

আর প্রিয়নবী ﷺ ওহুদের ময়দান থেকে ফিরলেন এই কথা বলে, 'আমি যখনই ডানে, বামে তাকিয়েছি, দেখেছি উম্মে উমারা আমার প্রতিরক্ষায় লড়াই করছে।'

******

উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওহুদের প্রান্তরে লড়াইয়ের প্রথম প্রশিক্ষণ নিলেন, যুদ্ধের ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করলেন.......

স্বাদ উপভোগ করলেন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর, ফলে জিহাদ থেকে দূরে সরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তাঁর নামে লিপিবদ্ধ রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অধিকাংশ যুদ্ধে শামিল থাকার বিরল গৌরবগাঁথা.......

তিনি হাজির ছিলেন হুদাইবিয়াতে, খাইবারে.... উমরাতুল কাযা-তে, হুনাইনে........ বাইয়াতে রিযওয়ানে.....

তিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন ইয়ামামার প্রান্তরে......

আল্লাহ তা'আলা হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি যেন খুশি হয়ে যান এবং তাঁকে খুশি করে দেন, কারণ তিনি ছিলেন মুমিন নারীদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত......

অটল, অবিচল জিহাদকারিনীদের মাঝে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া.....

এরকম অসংখ্য, অগণিত ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ইসলামের ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহ সমৃদ্ধ। আলহামদুলিল্লাহ।

[সুওয়ারুম মিন হায়াতিস্ সাহাবিয়্যাত, ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা]

শহীদ জননীদের সন্তান কুরবানীর ঈমানদীপ্ত কাহিনী:

প্রিয় ভাই! এই উম্মাহর মা-বোনেরা এই উম্মাহর গর্ব ও অহংকার। যুগে যুগে তারা সৃষ্টি করেছেন ত্যাগ-তিতিক্ষা আর কুরবানীর এমনসব ইতিহাস যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আমরা ধন্য এমন মায়েদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। আমরা ধন্য এমন বোনদের পেয়ে। তাদের জন্য আমাদের জান কুরবান হোক।

চলুন ভাই, ইসলামের জন্য আমাদের মায়েদের সন্তান কুরবানীর এমন কয়েকটি অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী শুনা যাক।

❀ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহার কুরবানী:

ইতিহাস হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহার সকল অবদান ও কৃতিত্বের কথা ভুলে যেতে পারলেও পুত্রের সর্বশেষ সাক্ষাতের সময় তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা, অবিচল প্রত্যয় আর বিচক্ষণতার কথা কখনোই ভুলতে পারবে না।

ঘটনাটি ছিল এই- ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার মৃত্যুর পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লহু আনহুকে খলীফা মেনে তাঁর পক্ষে যখন বাইয়াত নেওয়া হলো, হেজাজ, মিশর, ইরাক, খুরাসান ও সিরিয়ার প্রায় সকল অঞ্চল তাঁর পক্ষ নিল।

এদিকে বনু উমাইয়া অনতিবিলম্বে হাজ্জাজ বিন ইফসুফের নেতৃত্বে একদল দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল..... দুই দলের মাঝে সঙ্ঘটিত হলো ভয়াবহ যুদ্ধ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লহু আনহু সে যুদ্ধে দুর্দান্ত, দুঃসাহসী যোদ্ধার আক্রমণ পরিচালনা করে চূড়ান্ত বীরত্বের প্রকাশ ঘটালেন। তবে তাঁর সহযোদ্ধারা একটু একটু করে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকল। অবশেষে তিনি বাইতুল্লাহ বা কাবা শরীফে আশ্রয় নিলেন, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা কাবার প্রতিরক্ষার সাহায্যে আত্মরক্ষা করলেন....

তাঁর চূড়ান্ত শাহাদাতের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি সাক্ষাৎ করতে গেলেন মায়ের সঙ্গে, ততদিনে তিনি দৃষ্টি হারানো অতিবৃদ্ধা এক নারী, তিনি মাকে সালাম দিলেন-

আস্সালামু আলাইকুম ইয়া উম্মাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু..... (মা, তোমার প্রতি সালাম.......)

- ওয়া আলাইকাস্ সালাম ইয়া আব্দাল্লাহ....(বেটা! তোমাকেও সালাম) বেটা, যে সময় হাজ্জাজের কামান তোমার বাহিনীর বিরুদ্ধে হারামের মধ্যে বিশাল বিশাল পাথর নিক্ষেপ করছে, যা মক্কা নগরীর বাড়ি-ঘরকে প্রকম্পিত করে তুলছে, এমন নাজুক পরিস্থিতিতে তুমি এখানে কেন?

- তোমার সঙ্গে পরামর্শের জন্য এসেছি মা।

- আমার সঙ্গে পরামর্শ! কী বিষয়ে?!

- মা! লোকে আমাকে নিরাশ করে দিয়েছে, তারা হাজ্জাজের ভয়ে অথবা তার প্রতি মোহে আমার নিকট থেকে দূরে সরে গিয়েছে। এমনকি আমার নিজের পরিবারের ও আপন লোকেরাও আমাকে ফেলে দূরে সরে গেছে, এমন ছোট্ট একটি দলের সামান্য কয়েকজন মানুষ ছাড়া আমার সঙ্গে কেউ নেই। তাঁরা যত বড়ই কষ্ট সহিষ্ণু হোক না কেন, এক ঘণ্টার বেশি টিকতে পারবে না.....

বনু উমাইয়ার দূতেরা আমার নিকট বলাবলি করছে যে, আমি অস্ত্র ত্যাগ করে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের হাতে বাইয়াত হলে তারা আমাকে পৃথিবীর যা চাইব তাই দেবে, এ ব্যাপারে তোমার কী মত মা?

তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন- সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে হে আব্দুল্লাহ! তোমার মনের কথা তুমিই ভালো জানো।

যদি তোমার আস্থা থাকে যে, তুমি প্রতিষ্ঠিত আছো হকের উপর আর প্রয়াস চালাচ্ছ হক প্রতিষ্ঠার জন্য, তাহলে তুমি অবিচল থাকো, যেভাবে অবিচল ছিল তোমার সেই সঙ্গীরা, যাঁরা তোমার পতাকাতলে লড়াই করে শহীদ হয়েছে.....

যদি দুনিয়ার কিছু অর্জনের আশা তুমি পোষণ করে থাকো তাহলে কত যে খারাপ মানুষ তুমি......

তুমি নিজের জীবনটাও বরবাদ করেছ আর বরবাদ করেছ তোমার সঙ্গীদেরও।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন- কিন্তু আমি তো আজকেই নিহত হয়ে যাবো।

- সেটা তোমার জন্য অনেক ভালো স্বেচ্ছায় নিজেকে হাজ্জাজের হাতে তুলে দিয়ে নিজের কর্তিত মস্তক বনু উমাইয়ার বালকদের খেলতে দেওয়ার চেয়ে......

- আমি নিহত হওয়ার ভয় পাচ্ছি না। আমি ভয় পাচ্ছি, আমার মৃতদেহকে বীভৎসরূপে বিকৃত করা হবে।

- নিহত হওয়ার পর ভয় পাওয়ার আর কি আছে? যবাইকৃত ছাগল চামড়া ছিলার কষ্ট পায় না।

মমতাময়ী মায়ের মুখে বেদনাময় বাস্তব কথাগুলো শুনে, নিজের কর্তব্য স্থির করতে পেরে তাঁর চেহারা ঝলমল করে উঠল। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন-

মাগো, রহমত ও বরকতপ্রাপ্তা হও তুমি, তোমার সুমহান মর্যাদার আরও বৃদ্ধি ঘটুক। শুধু তোমার মুখের এই কথাগুলো শুনতেই ছুটে এসেছিলাম তোমার কাছে। আমার আল্লাহ জানেন, আমি শক্তিহীন, দুর্বল ও ক্লান্ত হইনি। এই দেখো মা, আমি এখন যাচ্ছি তোমার পছন্দনীয় পথে, আমি শহীদ হলে আমার জন্য দুঃখ করো না মা!

- বেটা, তোমার জন্য দুঃখ করতাম যদি তুমি বাতিলের জন্য জীবন দিতে। আলহামদুলিল্লাহ! প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে পরিচালিত করেছেন সেই পথে যা তাঁর পছন্দনীয় এবং যা আমারও পছন্দনীয়..... তুমি একটু আমার কাছে এসো বেটা, আমি একটুখানি তোমার ঘ্রাণ নেব, তোমার শরীরটা একটু ছুঁয়ে দেখব। কারণ, এটাই যে তোমার সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিচু হয়ে মায়ের হাতে ও পায়ে চুমু দিয়ে ভরে দিলেন আর মা পুত্রের মাথায় ও ঘাড়ে নাক ঘষে ঘষে ঘ্রাণ নিলেন আর চুমু দিয়ে মমতা মাখিয়ে দিলেন......

দুই হাত সচল রাখলেন তাঁকে স্পর্শ করতে। হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন-

-আব্দুল্লাহ এটা কী পরেছ?

- লৌহ বর্ম।

- যে ব্যক্তি শহীদ হতে চায় এটা তার পোশাক হতে পারে না বেটা।

- মা, এটা তো বরং তোমাকে খুশি করার জন্য পরেছি।

- ওটা খুলে ফেলো, তোমার ওই ভারী বর্মমুক্ত শরীরটাই হবে সাহসী ভূমিকার বেশি সহায়ক। সামনে-পিছে নড়াচড়ার জন্য সহজ...... তবে ওটার পরিবর্তে তুমি দ্বিগুণ পাজামা পরে নাও, যেন মাটিতে পড়ে গেলে তোমার ছতর উন্মুক্ত না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু লৌহবর্ম খুলে ফেললেন, কয়েকটি সালোয়ার পরলেন, এগিয়ে গেলেন হারামের দিকে, চিৎকার করে বলতে থাকলেন- মা, আমার জন্য তোমার দুআ বন্ধ করো না।

মা দু' হাত উর্ধ্বে উঠিয়ে বললেন- হে আল্লাহ, নামাযে তাঁর দীর্ঘ কিয়ামের প্রতি রহম করো, রহম করো গভীর রাতে জসৎবাসীর নিদ্রাবিভোর মুহূর্তে তাঁর বুক ফাটা ক্রন্দনের প্রতি.....

হে আল্লাহ, মক্কা-মদীনার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের দিনে নফল রোযা রেখে তার ক্ষুধা আর পিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করার প্রতি রহম করো, করুণা করো....

হে আল্লাহ, পিতা-মাতার প্রতি তাঁর আনুগত্যের ওপর রহম করো...

হে আল্লাহ, আমি ওকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছি তোমার জন্য, তুমি যা ফয়সালা করবে আমি তাতে সন্তুষ্ট, সুতরাং তাঁর ব্যাপারে আমাকে দান করো ধৈর্যশীলদের প্রতিদান......

ওই দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লহু আনহু পৌঁছে গেলেন আপন প্রভুর সান্নিধ্যে......

তাঁর শাহাদাতের দশ-পনের দিন পরই তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন তাঁর মা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা......

এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একশ বছর অথচ তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি একটুও হ্রাস পায়নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উভয়কে সর্বোত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

[সুওয়ারুম মিন হায়াতিস্ সাহাবিয়্যাত, ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা]

֍ হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার কুরবানী:

হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার পুত্র হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দূত হিসেবে ভণ্ড নবী মুসাইলামাতুল কাযযাব- এর নিকট পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ.........

মুসাইলামা বিশ্বাসঘাতকতা করে হযরত হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এমন নিষ্ঠুর-নির্দয়ভাবে হত্যা করে, যা শুনলে লোম শিউরে উঠে।

বিষয়টি ছিল এমন, মুসাইলামা প্রথমেই হযরত হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বন্দী করে জিজ্ঞাসা করে-

তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?

- হ্যাঁ।

- তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল?

- আমি শুনতে পাচ্ছি না, কী বলছ?

মুসাইলামা তাঁর ডান হাত কেটে দিল.......

এভাবে সে বার বার একই প্রশ্ন করতে থাকল আর হযরত হাবীব রাদিয়াল্লহু আনহু একই উত্তর দিতে থাকলেন। প্রত্যেকবার উত্তরের পর পাষণ্ড তাঁর একেকটি অঙ্গ কেটে ফেলছিল। দুই হাত, দুই পা কেটে ফেলার পরও তাঁর অবিচলতা দেখে মিথ্যুক মুসাইলামা তাঁর জিহ্বা কেটে আবার জিজ্ঞাসা করলো- তুমি কি আমাকে রাসূল বলে বিশ্বাস কর?

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মাথা নেড়ে অস্বীকার করলেন তার নবুওয়তকে।

'পাষাণ গলে যাবে' এমন কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করেও অটল, অনঢ় ঈমান নিয়ে অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। ইন্না.. লিল্লা..হি ওয়া ইন্না...ইলাইহি রা..জিঊ....ন।

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভয়াবহ এই শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছানো হলো তাঁর মা হযরত নাসীবা আল মাযেনিয়া (উম্মে উমারা) রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে। তিনি সব শুনে বেশি কিছু বললেন না। ছন্দে ছন্দে বললেন সামান্য একটু কথা-

مِنْ أَجْلِ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْقِفِ أَعْدَدْتُهُ
وَعِنْدَ اللهِ احْتَسَبْتُهُ
لَقَدْ بَايَعَ الرَّسُوْلَ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ صَغِيْرًا
وَوَفّٰى لَهُ الْيَوْمَ كَبِيْرًا

"এমন একটি ভূমিকার জন্যই আমি তাকে দুগ্ধ পান করিয়েছিলাম...
আমি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট, আমি প্রতিদান চাই তাঁর কাছেই....
শৈশবে সে 'আকাবার রাতে' শপথ নিয়েছিল প্রিয় নবীজীর হাতে....
অনেক বড় হয়ে আজ সে সেই অঙ্গীকারের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ঘটাল।"

[সুওয়ারুম মিন হায়াতিস্ সাহাবিয়্যাত, ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা]

❀ উম্মে ইবরাহীমের ঘটনা:

তারীখের কিতাবে বর্ণিত আছে, বসরা শহরে অনেক আল্লাহভীরু নেককার মহিলা ছিল। তাদের মধ্য থেকে অন্যতম একজন হলেন উম্মে ইবরাহীম আল হাশিমিয়্যাহ। তার সময়ে শত্রুরা মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে বসল এবং মুসলমানদেরকে হত্যা করার জন্য সামনে অগ্রসর হতে লাগল। তখন বসরার অলিতে-গলিতে "হাইয়্যা 'আলাল জিহাদ", "হাইয়্যা 'আলাল জিহাদ" বলে মানুষদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছিল। উদ্বুদ্ধকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন, সেই সময়কার বিশিষ্ট আলেম আব্দুল ওয়াহেদ যায়েদ আল বসরী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বসরার অলিতে-গলিতে ঘুরে ঘুরে ভাষণ দিচ্ছিলেন আর মানুষদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছিলেন।

একদিন কোনো এক মজলিসে তিনি মানুষদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে ভাষণ দিতে লাগলেন আর সেই বরকতময় মজলিসে বিশিষ্ট নেককার মহিলা উম্মে ইবরাহীমও উপস্থিত ছিলেন। আব্দুল ওয়াহেদ জিহাদ ও শাহাদাতের ফযীলত বর্ণনা করতে করতে জান্নাতের হুরদের আলোচনা শুরু করলেন। তিনি একের পর এক জান্নাতের হুরদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে লাগলেন। তাদের সৌন্দর্যতার বিবরণ দিতে লাগলেন। সকল শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছিল। তারা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল।

মজলিসের মাঝখান থেকে উম্মে ইবরাহীম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সোজা হেঁটে আব্দুল ওয়াহিদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি আব্দুল ওয়াহিদকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আবু উবায়েদ! আপনি তো আমার ছেলে ইবরাহীমকে ভালো করেই চিনেন। বসরার অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা আমার ছেলের সাথে তাদের মেয়েকে বিবাহ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদের কারো ব্যাপারেই সন্তুষ্ট নই। এবং আমি মনে করি তাদের কেউই ইবরাহীমের জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু আপনি এই মাত্র যেই মেয়েটির কথা বললেন, এই মাত্র যেই মেয়েটির বর্ণনা দিলেন, তাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি এই মেয়েটির সাথে ইবরাহীমকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাতে পারলে খুব খুশি হব। আমি এই জান্নাতী মেয়েটিকে আমার ছেলের বউ বানাতে চাই। আপনি কি ইবরাহীমের সাথে এই জান্নাতী রমনীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিতে পারবেন? হে আবু উবায়েদ! আমার ঘরে দশ হাজার দিনার আছে। আপনি এটাকে বিবাহের মোহরানা হিসেবে নিয়ে নিন। এবং ইবরাহীমকেও আপনাদের সাথে জিহাদে নিয়ে নিন, যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহাদাত নসীব করেন। এবং সে যেন আমার জন্য এবং তার বাবার জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে পারে।"

আব্দুল ওয়াহিদ একথা শুনে বললেন, "আপনি যদি একাজ করেন, তাহলে এটি আপনার জন্য, আপনার ছেলের জন্য, এবং তার বাবার জন্য মহাসাফল্য হবে। আল্লাহর কসম, এটা মহাসাফল্য।"

উম্মে ইবরাহীম সকলের মধ্য হতে তার ছেলেকে ডাকলেন। ইবরাহীম বলল, মা, আমি উপস্থিত।

তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার আদরের সন্তান! তুমি কি জিহাদের ময়দানে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়ার শর্তে এই মেয়েটিকে বিবাহ করতে রাজী আছ?

সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি সন্তুষ্ট।

উম্মে ইবরাহীম আল্লাহর দিকে ফিরলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক! আমি এই মেয়েটিকে আমার ছেলের সাথে বিবাহ দিচ্ছি এই শর্তে যে, সে নিজেকে জিহাদের ময়দানে কুরবানী করবে, সে নিজেকে জিহাদের ময়দানে উৎসর্গ করবে। এবং কখনোই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। এবং কখনোই যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করবে না। সুতরাং তাকে কবুল করে নাও, ইয়া রব্বাল আলামীন!"

এই দুআ করার পর তিনি দ্রুত বাড়িতে গেলেন এবং বাড়ি থেকে দশ হাজার দিনার নিয়ে আসলেন। যুদ্ধে যাবার জন্য তার আদরের সন্তানকে একটি ভালো ঘোড়া এবং অস্ত্র কিনে দিলেন।

ইবরাহীম যুদ্ধে যাবার জন্য রণসাজে সজ্জিত হল। কুরআন তিলাওয়াতকারীরা তাকে ঘিরে তিলাওয়াত করতে লাগল-

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনের জান ও মালকে ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।" (৯ সূরা তাওবা: ১১১)

উম্মে ইবরাহীম তার কলিজার টুকরা সন্তানকে বিদায় জানাতে এলেন। তিনি তার ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে আমার আদরের পুত্র! তোমাকে সাবধান করছি, এই যুদ্ধে কোনো গাফলতি নয়, তুমি তোমার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করবে, তুমি তোমার সর্বস্বকে উজাড় করে দিবে।"

তিনি তাকে একটি কাফনের কাপড় দিলেন, এবং তার কপালে চুমু খেয়ে বললেন, "ও আমার আদরের পুত্র! আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে আর কখনোই দুনিয়াতে পুনরায় একত্রিত না করেন। শেষ বিচারের দিনে মহামান্বিত ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর রহমতের ছায়াতলেই যেন আমাদের পুনরায় দেখা হয়।"

মুজাহিদীনগণ যাত্রা শুরু করলেন। আব্দুল ওয়াহিদ বর্ণনা করেন, "আমরা শত্রুদের এলাকায় পৌঁছলাম এবং শত্রুদের মুখোমুখি হলাম। শত্রুদের সাথে আমাদের তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। ইবরাহীম প্রথম সারিতে থেকে শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। কেননা, সে তো দুটি পুরস্কারের একটির অপেক্ষায় ছিল- হয়ত বিজয়, নয়ত শাহাদাত। তার মায়ের শেষ উপদেশ ছিল, এই যুদ্ধে কোনো গাফলতি নয়। তুমি তোমার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করবে। তুমি তোমার সর্বস্বকে উজাড় করে দিবে। তাই, ইবরাহীম তার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল। ইবরাহীমের তেজোদ্দীপ্ত ঘোড়া যেদিক দিয়েই যাচ্ছিল সেদিক দিয়েই কাফেররা পরাজিত হচ্ছিল। ইবরাহীমের ধারাল তলোয়ারের আঘাতে কাফেরদের গর্দানগুলি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছিল। ইবরাহীম ছিল কাফিরদের শরীরে কাঁটার মতো।

শত্রুরা বুঝতে পারলো এবং এই যুবক যোদ্ধার সাহসিকতা লক্ষ্য করল। তারা বুঝতে পারলো, যেভাবেই হোক, তাকে থামানো দরকার। তারা চতুর্দিক থেকে ইবরাহীমকে ঘিরে ফেলল। এবং সম্মিলিতভাবে আক্রমন করে ইবরাহীমকে শহীদ করে দিল। ইবরাহীম শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করল।"

আব্দুল ওয়াহিদ বর্ণনা করেন, যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আমরা বসরায় ফিরে এলাম। বসরার লোকজন আমাদেরকে স্বাগতম জানাতে লাগলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন উম্মে ইবরাহীম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, "ও আবু উবায়েদ! যদি আল্লাহ আমার উপহারকে কবুল করে থাকেন তাহলে আমাকে অভিনন্দন জানান। নতুবা আমাকে সান্ত্বনা দিন।"

আব্দুল ওয়াহিদ বললেন, হে ইবরাহীমের মা! আল্লাহ তা'আলা আপনার উপহারকে গ্রহণ করেছেন। ইবরাহীম আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবিত আছে। ইবরাহীম শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেছে। সে শহীদদের মধ্য থেকে একজন।"

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং রিযিকপ্রাপ্ত।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৬৯)

উম্মে ইবরাহীম আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যে যিনি আমার সন্তানকে শহীদদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।"

পরের দিন সকালে তিনি মসজিদে দৌঁড়ে গেলেন এবং বললেন, হে আবু উবায়েদ! বুশরা! বুশরা! (সুসংবাদ গ্রহন করুন! সুসংবাদ গ্রহণ করুন!) আমি গতরাতে আমার ছেলেকে স্বপ্নে দেখেছি, সে সবুজ মিনার সমৃদ্ধ খুব সুন্দর একটি বাগানে ছিল। সাদা মুক্তার তৈরি একটি বিছানায় শুয়ে ছিল। তার মাথায় একটি মুকুট ছিল। সে আমাকে বলল, হে মা! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার দেয়া মোহরানা গৃহীত হয়েছে। এবং আমরা জান্নাতে আমাদের বিয়ে উদযাপন করছি।"

[https://archive.org/details/hd_20200327]

ঞ্জ এক মায়ের হাফেয ছেলেকে জিহাদে পাঠানোর কাহিনী

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ, আমাদের সালাফদের মধ্য হতে তিনি একজন বড় মুজাহিদ ছিলেন। জিহাদের ময়দানে তার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। বিশেষ করে রোমানদের বিরুদ্ধে তিনি অনেক যুদ্ধ করেছেন। আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ একবার মসজিদে নববীতে বসে তার আরব বন্ধুদের সাথে গল্প করছিলেন। তখন তার বন্ধুরা বলল, আবু কুদামা! তুমি তো তোমার সারাটি জীবন জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছ, জীবনে অনেক জিহাদ করেছ, আজকে তুমি আমাদেরকে জিহাদের ময়দানের এমন একটি ঘটনা শুনাও, যে ঘটনাটি তোমাকে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যান্বিত করেছে।

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আচ্ছা শুন! রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সময় আমরা একবার ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত দিকা নামক শহরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে, আমি একটি উট কিনার জন্য এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলাম। আমাদের অবস্থানের খবর শুনে একজন মহিলা আসল। সে আমার সাথে দেখা করল এবং বলল, আমার স্বামী জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ছেলেও জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ভাই ছিল, তারাও জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে গিয়েছেন। এখন শুধুমাত্র আমার একটি ছেলে বাকী আছে, আর ছোট্ট একটি মেয়ে। আমার ছেলেটির বয়স পনের বছর। সে হাফেযে কুরআন, হাদীসের ব্যাপারে ভালো জ্ঞান রাখে, দক্ষ অশ্বারোহী, দেখতেও খুব সুশ্রী। আমার খুব ইচ্ছা ছেলেটিকে জিহাদে পাঠাব। কিন্তু সে একটি কাজে শহরের বাইরে গেছে। এখনো পর্যন্ত ফিরে আসেনি। অপেক্ষায় আছি, সে আসলে আপনার সাথে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিব। আর এখন আপনাকে দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই। আফসোস, এত মহান একটি জিহাদ হচ্ছে আর আমি এটা থেকে বঞ্চিত থাকব, এটা তো কিছুতেই হতে পারে না! তখন তিনি ধুলায় মাখা কয়েকটি চুল দিয়ে বললেন, এই চুল গুলোকে আপনি ঘোড়ার লাগাম হিসেবে ব্যবহার করবেন, যাতে এই বরকতময় জিহাদে অংশগ্রহণ করা হতে আমি যেন কিছুতেই বঞ্চিত না হই।

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি তার চুলগুলো নিলাম এবং তার ছেলেকে দেখার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম, পিছন দিক থেকে একজন অশ্বারোহী ধুলো উড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। কাছে আসার পর যুবকটি আমাকে চাচা বলে ডাকল আর বলল, আমি ঐ মহিলার সন্তান যিনি আপনাকে জিহাদের জন্য চুল দান করেছিলেন। আমি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চলে এসেছি।

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি লক্ষ্য করলাম, এই ছেলেটি একেবারেই ছোট। চোদ্দ-পনের বছর হবে মাত্র। আর জিহাদ তো তার জন্য আবশ্যকও নয়। তাই আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম, বাবা, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। বাড়িতে গিয়ে তুমি তোমার মায়ের পাশে থাক, মায়ের খেদমত কর, মায়ের সেবা কর। তুমি আপাতত ফিরে যাও। তুমি বড় হয়ে এরপর জিহাদে অংশগ্রহণ করো।

ছেলেটি বলল, চাচা, আমার মা আমাকে শেষ বিদায় দিয়েছেন, তিনিই আমাকে আপনার সাথে থেকে জিহাদ করতে বলেছেন। আর আমি ভালো ঘোড়সওয়ার, দক্ষ তীরন্দাজ। আপনি আমাকে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে পাবেন। কখনো জিহাদ হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীরূপে পাবেন না। আপনি আমাকে সাথে নিন।

অনেক কাকুতি মিনতি করার পর আমি তাকে সাথে নিয়ে চললাম। আমরা কিছু পথ অতিক্রম করে এক জায়গায় তাঁবু গাড়লাম, এবং যাত্রা বিরতি করলাম। মুজাহিদীনরা সবাই রোযা রেখেছিলেন। তাই সফর করে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বিকাল বেলা আবার রান্না করতে হবে।

ছেলেটি বলল, চাচা, আপনারা সবাই রোযা রেখেছিলেন, সবাই খুব ক্লান্ত। তাই দেন, রান্না বান্নার কাজটা আমিই করি। সে জোর করে বলল। তাই রান্নাবান্নার কাজটা তাকেই দেয়া হল। মুজাহিদীনরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। রান্না করে এক পর্যায়ে সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ঘুমন্ত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঘুমের মাঝে সে মিটমিট করে হাসছে। আমি অন্যান্য মুজাহিদ সাথীদেরকেও বিষয়টি দেখালাম। ছেলেটির ঘুম ভাঙার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি হাসছিলে কেন? সে বলতে চাইল না।

অনেক জোরাজুরির পর সে বলল, আমি দেখলাম, স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা নির্মিত বিশাল একটি প্রাসাদ। প্রাসাদটি দেখতে মনে হচ্ছে চাঁদের মত উজ্জ্বল। অনেকগুলো সুন্দর মেয়ে সে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আমাকে অভিভাদন জানাতে লাগল। আমাকে তারা অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। তাদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে আমাকে ডাক দিয়ে বলল, 'হে মার্জিয়ার স্বামী! মার্জিয়া উপরে আছে।'

আমি উপরে চলে গেলাম। উপরে গিয়ে দেখি, অত্যন্ত সুন্দর একটি মেয়ে বসে আছে। যার উজ্জ্বলতা সূর্যের আলোকেও হার মানায়। আমি তাকে স্পর্শ করার জন্য তাড়াহুড়া করছিলাম। সে আমাকে বলল, 'ধৈর্য ধর, এখনো সময় হয়নি। আগামীকাল দুপুরে তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করবে।' এরপর আমার ঘুম ভেঙে গেল।

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পরের দিন রোমানদের বিরুদ্ধে আমরা তুমুল যুদ্ধ শুরু করলাম। এক পর্যায়ে আমরা বিজয় লাভ করলাম। রোমানরা পরাজিত হল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, আমাদের অনেক সাথী আহত হয়ে ময়দানে পড়ে আছে। সাথীরা আহতদের খুঁজছে। আমিও আহতদের মধ্যে মনে মনে ঐ ছেলেটিকে তালাশ করতে লাগলাম। চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, সে কোথায় আছে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম সে ছেলেটি রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে আছে। আমি দৌড়িয়ে ওর কাছে গেলাম। সে আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'চাচা, আমিতো শহীদ হয়ে যাচ্ছি। আমার এই রক্তমাখা জামাটা আমার মাকে গিয়ে দিবেন। আর বলবেন, আপনার ছেলে তার ওয়াদা পূর্ণ করেছে। সে লড়াই করতে করতে বিজয় এনেছে, পিছু হটে নি। এতে করে আমার মা সান্ত্বনা পাবেন। আর বাড়িতে আমার ছোট একটি বোন আছে। বাড়িতে তো কেউ ছিল না, তাই ও আমার কাছে থাকত। আমি ওকে অনেক আদর করতাম। ও আমাকে বাড়ি হতে বের হতে দিত না। সবসময় 'ভাইয়া' 'ভাইয়া' বলে ডাকত। আপনি যখন আমার বাড়িতে যাবেন, তখন আমার ছোট্ট বোনটাকে একটু সান্ত্বনা দিবেন। আর আমার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলবেন, আমি শহীদ হয়েছি। আপনি সৌভাগ্যবান শহীদের মা। আর চাচা, আমি যে আপনাকে আমার স্বপ্নে দেখা মার্জিয়ার কথা বলেছিলাম, মার্জিয়া আমার মাথার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।' এই বলে ছেলেটি শহীদ হয়ে গেল।

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পরবর্তীতে যখন আমরা বাড়ি ফিরছিলাম, তখন আমরা সে ছেলেটির বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে গিয়ে দেখি, ওর ছোট বোনটি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওকে বললাম, তোমার মাকে ডাক।

ছেলেটির মা আসল এবং আমাকে বলল, আপনি কি আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন, না সুসংবাদ দিতে এসেছেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সান্ত্বনা কোনটা আর সুসংবাদ কোনটা? তিনি বললেন, আমার ছেলে যদি সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে আমাকে সান্ত্বনা দিন, আর আমার ছেলে যদি শহীদ হয়ে থাকে তাহলে এটা হবে আমার জন্য সুসংবাদ। আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আপনার ছেলে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়েছে, সে পিছু হটেনি।' তখন ঐ মহিলা বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি আমার এই ছেলেকে পরকালে আমার নাজাতের উসীলা বানালেন।'

[https://archive.org/details/hd_20200327]

মুসলিম উম্মাহর সম্মানিতা মা-বোনদের প্রতি একটি উন্মুক্ত পত্র:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আস্সালামু আলাইকুন্না।

মুহতারাম মা আমার! প্রিয় বোন আমার!

আল্লাহ পাক আপন সত্তা ও গুণাবলিতে সকল কিছু থেকে পবিত্র এবং তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান ও স্নেহশীল। তিনি তাঁর হাবীব ﷺ-কে পুরো সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যাকে সঠিক ও সত্য দ্বীন সহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে যেন অপরাপর সকল দ্বীনের উপর তা জয়যুক্ত হয়ে যায়। যিনি ছিলেন তাঁর উম্মতের প্রতি অত্যন্ত রহমদিল ও স্নেহশীল। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব ﷺ -কে এমন পুরস্কার দান করার ওয়াদা করেছেন যা তাঁর হাবীবকে খুশি করে দিবে। হে আল্লাহ, আপনার হাবীবের প্রতি আমাদের সকলের পক্ষ থেকে দরূদ ও সালাম পৌঁছে দিন। সালাম বর্ষিত করুন আহলে বাইত সকল "আম্মাজানদের" প্রতি এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি। আম্মা বা'দ।

আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান,

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

"আল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তিনি ছাড়া কেউ তা সরাতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করতে চান, তবে তো সব কিছু করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।" (সূরা আন'আম ৬:১৭)

আমরা মুসলমান, আল্লাহ তা'আলার কথার উপর এবং তাঁর হাবীবের ﷺ প্রদত্ত খবরের উপর আমাদের বিশ্বাস ও ভরসা থাকা চাই। যদি আমরা পরিপূর্ণরূপে দ্বীনের উপর থাকি, আল্লাহ পাককে সবসময় সাথে পাবো ইনশাআল্লাহ্। আর যদি পরিপূর্ণরূপে দ্বীনের উপর না থাকি, তাহলে যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হোক না কেন, আল্লাহ পাককে সাথে পাবো না। তখন আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত সবই বৃথা হয়ে যাবে।

আমরা প্রিয় নবীজী ﷺ-এর সেই বিখ্যাত হাদীসটি স্মরণ করি যেখানে তিনি ﷺ ইরশাদ ফরমান,

بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

"ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল, আবার শীঘ্রই তা অপরিচিত হয়ে যাবে। তখন সেই অপরিচিত ইসলামের উপর যারা টিকে থাকবে তাদের জন্য সুসংবাদ।" (সহীহ মুসলিম-১৪৫)

আমার প্রিয় মা! আমার প্রিয় বোন!

দয়া করে আমরা এমন মনে না করি যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমজান মাসের সিয়াম পালন, কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা, বাচ্চা দেখা-শুনা করা, রান্নাবান্না করা, স্বামীর খেদমত করা আর পর্দায় থাকা ছাড়া ইসলামে আমার আর কোনো কাজ নেই; হায়, ইসলাম তো এমন নয়!

আমরা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, আজ পৃথিবীতে আমাদের মহান ধর্ম ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ কী অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছে! আজ কুফুরিশক্তিগুলো মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ ও গণহত্যা চালাচ্ছে। মুসলমানদের জন-জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। আজ যেন মুসলিমরা নিজ ভূমিতে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। দুনিয়ার সকল কুফ্ফার শক্তি এক হয়ে আজ ইসলাম ও মুসলিম নিধনের উন্মত্ত খেলায় উন্মাদ হয়ে গেছে। মুসলমানদের রক্ত

নিয়ে আজ 'জোয়া' খেলায় মত্ত হয়েছে। মা-বোনদের ইজ্জত আব্রু হরণ করাকে ক্রীড়ার বিষয়ে পরিণত করেছে। মুসলিমদের ভূমিগুলোকে একের পর এক দখল করে যাচ্ছে। জায়নবাদ, খ্রিস্টবাদ আর হিন্দুত্ববাদের কালো থাবা কী ভয়ানক রূপে এই উম্মাহকে আজ গ্রাস করছে! এমতাবস্থায় উম্মাহর একজন দরদী মা কিংবা বোন হিসেবে কি আমাদের কিছুই করনীয় নেই? আমাদের দায়িত্ব কি কেবল ঘর-সংসার করার মাঝেই সীমাবদ্ধ?

মুসলিম উম্মাহর সকল মাযহাব ও মতাদর্শের উলামায়ে হক এই ব্যাপারে একমত যে, বর্তমান যামানাই সেই যামানা যখন চলমান বিশ্বপরিস্থিতিতে সক্ষম সকল মুসলিম নর-নারীর উপর জিহাদ ফরযে আইন, যেমনভাবে নামায-রোযা-হজ্জ-জাকাত ফরয। এমনকি বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্তানের জন্য পিতামাতার নিকট কিংবা স্ত্রীর জন্য স্বামীর নিকট হতে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য অনুমতি গ্রহনের প্রয়োজনীয়তাও নেই। (এই ব্যাপারে বক্ষ্যমাণ কিতাবের দ্বিতীয় পর্ব 'তাওহীদ ও জিহাদ' নামক কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখান থেকে দেখে নেয়া যায় ইনশাআল্লাহ।)

আমার প্রিয় মা! আমার প্রিয় বোন!

আল্লাহ পাক তার প্রত্যেক বান্দাকে তার অবস্থানে রেখে পরীক্ষা করেন এবং কাউকে এমন কোনো পরীক্ষায় ফেলেন না কিংবা এমন কোনো দায়িত্ব অর্পন করেন না যা সামাল দেয়া বা বহন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেন না।" (সূরা বাকারা ২: ২৮৬)

পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উপরও এই মহান শরীয়ত জিহাদের হুকুম অর্পন করেছে। সুবহানাল্লাহ! আর এ ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ববর্তী (সালাফ) নারীগণ আমাদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন, কিভাবে তারা জিহাদকে ভালোবেসেছেন, কিভাবে তারা নিজেদের সাধ-আহ্লাদকে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে কুরবানী করেছেন, কিভাবে তারা নিজেদের স্বামী-সন্তান-ভাইদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাদেরকে ময়দানে পাঠিয়েছেন, কিভাবে তারা কলিজার টুকরা সন্তান ও প্রিয়জনদের শাহাদাতে সবর করেছেন, পরকালের প্রতিদানের আশায় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি প্রদর্শন করেছেন, কিভাবে তারা দুনিয়ার দুঃখ কষ্টগুলো হাসিমুখে, মুখবুজে সয়ে গেছেন, কিভাবে অনেকে আবার জিহাদের ময়দানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লড়াইও করেছেন আর এভাবেই তারা তাদের উপর অর্পিত জিহাদের ফরয দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে গিয়েছেন! আল্লাহু আকবার!

সুতরাং জিহাদের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়গুলো ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ। নতুবা আমরাও ফরয তরককারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

প্রিয় মা! প্রিয় বোন!

প্রশ্ন করতে পারেন, বর্তমান যামানায় আমরা নারীরা কিভাবে জিহাদের ফরযিয়াত আদায় করব?

আমরা অনেক উপায়ে জিহাদের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি ইনশাআল্লাহ। যেমন: আমাদের স্বামী-সন্তান আর ভাইদেরকে দাওয়াত, ই'দাদ ও জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, তাদের মনে জিহাদী চেতনা ও মানসিকতা গড়ে তোলা, জিহাদের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা, তাদেরকে জিহাদের ময়দানে পাঠানো, অর্থ-সম্পদ দিয়ে মুজাহিদ ভাইদেরকে

সহযোগিতা করা ও জিহাদের কাজকে বেগবান করা, মুজাহিদ ভাইদেরকে আশ্রয় দেয়া, নিজেদের বাড়িতে মুজাহিদ ভাইদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা, সর্বাত্মক সহায়তা করা, তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি।

আমাদের স্বামী-সন্তান-ভাইয়েরা জিহাদের প্রয়োজনে আমাদেরকে সাথে করে কিংবা একাকী হিজরত করলে তাদের সঙ্গ দেয়া কিংবা তাদের বিচ্ছেদে সবর করা। এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে চলবো, আমাদের রুজী-রোজগারের কী হবে, এই চিন্তায় যেন আমরা চিন্তিত না হই! যদি এই চিন্তায় আমরা ধৈর্যহারা হয়ে যাই, তাহলে আমাদের যিন্দেগীতে আল্লাহ কোথায় আছেন, তাঁর স্থান কোথায়?

আমার স্বামী-সন্তান-ভাই কি আমার রব (প্রতিপালক)? বিয়ের আগে আমার পিতা আমাকে পালেননি, পেলেছেন আমার আল্লাহ!

বিয়ের পরে আমার স্বামী-সন্তান আমাকে পালছেন না, পালছেন আমার আল্লাহ! তারা যদি জিহাদে চলে যায়, শহীদ হয়ে যায়, কিংবা ঘরে পড়ে আজকেই মারা যায়, তবুও যিনি আমাকে পালবেন তিনি তো আর কেউ নয়, আমার আল্লাহ!

তারা যদি আমাদেরকে রেখে যায়, কিংবা সাথে নিয়ে হিজরত করে, সেখানেও আমাদের পালবেন আমাদের আল্লাহ! তিনিই তো রিযিকদাতা! আমাদের পালনকর্তা হিসেবে তিনিই কি যথেষ্ট নন?...............

প্রিয় মা! প্রিয় বোন!

বর্তমানে আমাদের উপর সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো, স্বামী-সন্তান ও ভাইয়ের বিচ্ছেদে সবর করা। জিহাদের প্রয়োজনে তারা হিজরত করলে, কিংবা কারারুদ্ধ হলে, কিংবা আহত হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে, অথবা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করলে প্রতিদান লাভের আশায় ধৈর্য ধারণ করা। এতে ঘরে বসেও আমরা পরিপূর্ণ জিহাদের সওয়াব পাবো, ইনশাআল্লাহ।

আমরা হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রীর কথা স্মরণ করি। কিভাবে তিনি সবর করেছিলেন, যখন তাঁর স্বামী তাকে বাসর রাতে ফরয গোসলের হালতে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ময়দানে আর সেদিনই শহীদ হয়ে যান!

আমরা হযরত হাযেরা আলাইহাস্ সালাম ও তাঁর সন্তান হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের কথা স্মরণ করি। কিভাবে তাঁরা আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজেদেরকে কুরবানী করেছিলেন, আল্লাহর জন্য সবর করেছিলেন, যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদেরকে আল্লাহর হুকুমে জনমানবহীন ধু ধু মরুভূমির বুকে খাদ্য-পানীয়বিহীন অবস্থায় ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন! আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ধ্বংস করেননি, বরং তাদেরকে ইজ্জতের সাথে দুনিয়াতে রেখেছেন এবং জান্নাতকে তাদের দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

সুতরাং আল্লাহর হুকুম পালনার্থে যদি আমাদের স্বামী-সন্তান-ভাইয়েরা আমাদেরকে রেখে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও ধ্বংস করবেন না, দুনিয়া ও আখিরাতে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তিনিই পরকালে আমাদেরকে নাজাত দিবেন ও জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নির্ঝরিনীসমূহ প্রবাহিত!

আরেকটি বিষয় চিন্তা করি!

আমাদের স্বামী-সন্তান ও ভাইয়েরা যদি শহীদ হয়, তাহলে আমরাও তাদের সাথে সাথে শহীদের মর্তবা পাবো ইনশাআল্লাহ্। কিভাবে? কেন নয়, আমাদের মৃত্যুর পর কি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সেই জান্নাতে পাঠিয়ে দিবেন না, যে জান্নাত তারা শাহাদাত লাভ করে পেয়েছে? সেই জান্নাতে কি তাদের সাথে আমাদেরকে একত্রিত করে দিবেন না, যেই জান্নাত তারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে লাভ করেছে? সুবহানাল্লাহ!

একটু চিন্তা করুন, আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উপর কী পরিমাণ মেহেরবান!
আমরা ঘরে বসে থেকে একটু সবর করে কত নিয়ামত লাভ করলাম!
আর আমাদের দুনিয়ার এই বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ নয়, অনন্তকালের বিচ্ছেদ নয়; এই বিচ্ছেদ সাময়িক, ক্ষণকালের। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যা দিবেন, তাতে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে, দিল্ ভরে যাবে। এরপর আমরা আর পৃথক হবো না ইনশাআল্লাহ।
সুতরাং প্রিয় মা! প্রিয় বোন! আমাদের স্বামী-সন্তান কিংবা ভাইয়েরা জিহাদে গিয়ে যদি আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন, কিংবা তাগুতের কারাগারে বন্দী হন কিংবা মহাসৌভাগ্যবান শহীদী কাফেলার সাথী হয়ে যান, তাহলে প্রিয় মা আমার, প্রিয় বোন আমার, আমরা কি পারি না একটু সবর করতে? একটু কষ্ট করে দুনিয়ার যিন্দেগীতে নিজের চাহিদাগুলোকে আখিরাতের জন্য রেখে দিতে? নিজের আরাম-আয়েশ আর সুখ-আহ্লাদগুলোকে কবর, হাশর আর জান্নাতের জন্য রেখে দিতে? একটু চিন্তা করি, আমার স্বামী কি শখের বশবর্তী হয়ে জিহাদে গিয়েছে? সে তো আল্লাহর জন্যই তার যিন্দেগীর সকল সাধ-আহ্লাদ, আনন্দ-সুখ আর প্রেম-ভালোবাসাকে কুরবানী করেছে, এবং আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। এদিকে, আমিও কি পারবো না, জিহাদের জন্য তার এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের আশায় সবর করতে? পরকালে আমাকে যে 'একজন মুজাহিদের স্ত্রী' কিংবা 'একজন শহীদের স্ত্রী' হিসেবে আমার স্বামীর সাথে একজন মুজাহিদ/শহীদের জান্নাতে স্থান দেয়া হবে, পিতামাতাকে তার শহীদ সন্তানের সাথে স্থান দেয়া হবে, যা একশত স্তর বিশিষ্ট হবে আর প্রতিটি স্তরের বিস্তৃতি হবে আসমান যমীনের সমান (সুবহানাল্লাহ!), সেই জান্নাতের আশায় বুক বেঁধে আমরা কী ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারবো না?
আরেকটু চিন্তা করি, আমার স্বামী, যে আমাকে রেখে আল্লাহর হুকুমকে বাস্তবায়ন করতে ময়দানে চলে গেছেন, সে কি খুব আরামে আছে? সে কি না খেয়ে, না ঘুমিয়ে কষ্ট করছে না? বুলেটের আঘাতে, বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে না? ব্যথায়-কষ্টে ছটফট করছে না? সে কি এখন চিন্তা করছে না, 'এখন যদি আমার প্রেমময়ী, সোহাগিনী স্ত্রী আমার কাছে থাকতো, তাহলে সে আমার সেবা-শুশ্রুষা করতো, একটু আদর করতো, একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দিত, কষ্টের দিনগুলোতে একটু সান্ত্বনা দিত, যেমনটি সে বাড়িতে থাকতে আমি অসুস্থ হয়ে গেলে করতো?'
আহ্! আপনার স্বামী কি আপনার বিচ্ছেদে কান্না করছে না? আপনার জন্য কি তার বুক ফেটে যাচ্ছে না? আপনাকে কাছে পেতে, আপনার একটু ভালোবাসা ও প্রেম পেতে তার মন কেমন বেচাইন হয়ে আছে, একটু চিন্তা করুন তো! একটু চিন্তা করুন তো, তিনি কেন এই কষ্টের যিন্দেগী বরণ করে নিয়েছেন? হ্যাঁ, শুধুমাত্র, কেবলমাত্র আল্লাহর একটি ফরয বিধান তার ও আপনার মাঝে সাময়িক বিচ্ছেদের একটি রেখা টেনে দিয়েছে। হায়! তিনি তো আল্লাহর একটি বিধানের জন্যই সবকিছু কুরবানী করেছেন। সুতরাং যদি আমিও তার মত ধৈর্য ধারণ করতে না পারি, তাহলে কি দয়াময় আল্লাহ আমাকে পরকালে তার সাথে নেয়ামতে ভরা, সুউচ্চ জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য দান করবেন?
প্রিয় বোন আমার! আমাদের জীবনে কষ্ট-মুসীবত আর পরীক্ষা আসবেই, আসতেই থাকবে। এটিই আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ -وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।" (২৯ সূরা আনকাবূত: ২-৩)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। আর সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।' (সুরা আল-বাকারা : ১৫৫)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থান সমূহ যাচাই করি।" (৪৭ সূরা মুহাম্মাদ: ৩১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

'তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে; অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর তাদের এমনই শিহরিত হতে হয়েছে, যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।' (সুরা আল-বাকারা : ২১৪)

এ আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবেই জান্নাতে যাওয়ার আশা করার কথা বলেছেন। পরীক্ষা তাও যেই সেই নয়, নবীদের উপর যেমন পরীক্ষা এসেছে! আর নবীদের উপর পরীক্ষার ধরণ এতটাই কঠিন ছিল যে, নবী ও তাঁর উম্মত সবাই পেরেশান হয়ে গেছেন এই ভেবে যে, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : مَا لعَبدِى المُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلا الجَنَّةَ

'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যদি কোনো মুমিনের প্রিয়জনকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাই, আর সে সওয়াবের আশায় সবর করে, আমার কাছে তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।' (সহিহুল বুখারি : ৮/৯০, হা. নং ৬৪২৪)

আমার প্রিয় বোন! আমার প্রিয় মা! বলুন, মুসলিম উম্মাহর-

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা আল্লাহর রাস্তায় সন্তান কুরবানী করার জন্য আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদেরকে মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদেরকে শহীদ হিসেবে দেখার জন্য ছোট্ট সময় দুগ্ধপান করাতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যাদের মাতৃদুগ্ধে এই পরিমাণ ধার ছিলো যে, তাদের সন্তানরা কিসরা কায়সারের সাম্রাজ্যগুলোকে তছনছ করে দিয়েছিলো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা নিজের হাতে অস্ত্র ক্রয় করে সন্তানের হাতে তুলে দিতো, এই আশায় যে, তার সন্তান আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত লাভ করবে?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের পুত্র বধূ হিসেবে জান্নাতের হূরদের দেখতে বেশি ভালোবাসতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদের সাথে হূরের বিবাহের জন্য দুনিয়াতে মোহরানা আদায় করে দিতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদের শাহাদাতের উপর গর্ববোধ করতো?

আজ কোথায় সেই মায়েরা, যাদের সন্তান শহীদ হলে তার বাড়িতে বিয়ে বাড়ির আমেজ চলে আসতো? আনন্দ মিছিল বের হতো? আজ কোথায় তারা?

কোথায় আজ ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব?

কোথায় আজ উম্মে উমারা?

কোথায় আজ আসমা বিনতে আবু বকর?

(রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না আযমাঈন)

সেই মায়েরা আজ কোথায়?

সেই স্ত্রীরা আজ কোথায়, যারা বাসর ঘর থেকে তাদের স্বামীদেরকে জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের জন্য পাঠিয়ে দিতো?

কোথায় আজ তারেক বিন যিয়াদ আর মুহাম্মাদ বিন কাসীমের বোনেরা?

পরম মমতাময়ী, সোহাগিনী, প্রেমময়ী কিন্তু পাহাড়ের মতো অটল-অবিচল ঈমানওয়ালী; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বতকারিনী, প্রিয়তমের বিচ্ছেদে সবরকারিনী আমার সেই বোনেরা আজ কোথায়?

কেন আমরা আবারো বুকে পাথর বেঁধে ধৈর্য ধারণ করছি না?

কেন আমরা আজ আরো লাখো মুসলিম মা-বোনের উপর অত্যাচার-নির্যাতন আর ধর্ষণের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আমাদের স্বামী- সন্তান-ভাইদেরকে ময়দানে পাঠাচ্ছি না?

আল্লাহ তা'আলা আমার হাবীব ﷺ-এর উম্মতের মা-বোনদের প্রতি রহম করুন। তাদের ইজ্জত-আব্রুর সর্বোচ্চ হেফাযত করুন। আমীন।

মাআস্সালাম।

পিতা মাতার প্রতি একটি বিদায়ী চিঠি

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!
সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বে কারীমের যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পথ দেখিয়েছেন, তাঁর হুকুম মানাকে আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। আশাকরি, তাঁর আনুগত্য করে আমরা কখনো ব্যর্থ মনোরথ হবো না, কেননা তিনি ওয়াদা করেছেন, মুমিনদের নেক আমলগুলোকে তিনি কখনো বিনষ্ট করবেন না, উপরন্তু পরিপূর্ণ বদলা দিবেন।
সালাম ও দরুদ সেই মহান হাবীবের ﷺ প্রতি যিনি বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ ছিলেন, যিনি ছিলেন পৃথিবীর বুকে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মহানায়ক, আমাদের দুই জাহানের নেতা, যার ভালোবাসায় আমরা আমাদের সর্বস্ব কুরবানী করে দিতে সদাপ্রস্তুত।

পরম শ্রদ্ধেয় মা-বাবা আমার!
আল্লাহ তা'আলা হুকুম করেছেন যেন আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনি, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করি এবং যেন পিতা মাতার অনুগত থাকি, আপনাদের মহব্বত করি, আপনাদের খেদমত করি। এগুলো সন্তান হিসেবে আমার উপর ফরয (অবশ্য করণীয়) দায়িত্ব। এগুলো আমাকে করতেই হবে। একই সাথে বিশ্বজগতের পালনকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন, যেন আমি তাঁকে, তাঁর রাসূলকে এবং তাঁর পথে জিহাদ করাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, ইসলামের জন্য নিজের জান-মাল দিয়ে যুদ্ধ করি। এটিও আমার উপর ফরয করেছেন। তাই আমি আজ আল্লাহ তা'আলার হুকুমকে বাস্তবায়ন করতে জিহাদের ময়দানে যাচ্ছি।

উলামায়ে কেরাম বলেন, "ঈমান আনার পর প্রথম ফরয হচ্ছে, মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা। যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত পরিমাণের জায়গাও কুফ্ফাররা দখল করে নেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় (জিহাদ করতে সক্ষম সকলের উপর ফরয হয়ে যায়)। ঐ মুহূর্তে জিহাদে বের হওয়ার জন্য পিতা-মাতার কাছ থেকে তার সন্তানের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না এবং স্বামীর কাছ থেকে তার স্ত্রীরও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।"

আর বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে জিহাদ অবশ্যই ফরযে আইন, যেমন নামায-রোযা ফরয আইন। এ বিষয়ে সকল মত আর মাযহাবের ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর তাই জিহাদের প্রয়োজনে দাওয়াত ও ই'দাদ, হক জিহাদী তাঞ্জীমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, আমীরের হুকুম বা নির্দেশনা অনুযায়ী জিহাদের সকল তাকাজা পুরা করা, প্রয়োজনে জিহাদের জন্য হিজরত করা- এসবই বর্তমানে ফরযে আইন। আর শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় এসকল কাজের জন্য পিতামাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। এজন্য জিহাদে সম্পৃক্ত হওয়া কিংবা জিহাদের জন্য হিজরত করার ব্যাপারে আপনাদের অনুমতির অপেক্ষা আমি করিনি। আপনাদেরকে না জানিয়েই চলে যাচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

"আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে যালেম (অত্যাচারী)! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। যারা ঈমানদার, তারা জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।" (সূরা নিসা ৪:৭৫,৭৬)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ

"আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে।" (সূরা বাকারা ২:১৯০)

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরি ও সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (সূরা আনফাল ৮:৩৯)

প্রিয় আম্মা-আব্বা আমার!

আপনারা দয়া করে একটু চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, মায়ানমার, কাশ্মীর, আসাম, চেচনিয়া, উইঘুর সর্বত্র কেবল মুসলিম নিধনের মহড়া চলছে। মুসলিম মায়ের বুক খালি করা হচ্ছে, বাবার সামনে সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য বাতিল তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মা! আমি বেঁচে থাকব আর এ পৃথিবীতে ঈমান, নামায, রোযা, হজ, যাকাত থাকবে না তা কী করে হতে পারে? বাবা! আমি বেঁচে থাকবো আর দীন ইসলাম দুনিয়া হতে মিটে যাবে তা কী করে মেনে নেয়া যায়? আমি যদি ঘরে বসে থাকি, আর এই হালতে আমার মৃত্যু চলে আসে, হায়! এই মুখ আমি কিভাবে আল্লাহকে দেখাব, আমার রাসূলের ﷺ সামনে আমি কিভাবে দাঁড়াব? আমি কিভাবে ঘরে বসে থাকব, অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"৩৮. হে ঈমানদারগণ! এ কি হলো তোমাদের! যখন তোমাদের আল্লাহ তা'আলার পথে (কোনো অভিযানে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমীন আঁকড়ে ধরো; তোমরা কি আখেরাতের (স্থায়ী কল্যাণের) তুলনায় (এ) দুনিয়ার

(অস্থায়ী) জীবনকে নিয়েই বেশি সন্তুষ্ট? (অথচ) পরকালে (হিসাবের মানদন্ডে) দুনিয়ার ভোগসামগ্রী নিতান্তই কম। ৩৯. তোমরা যদি (তাঁর পথে) না বের হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৮-৩৯)

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা (ক্ষতি বা) বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত (দেখ, তোমাদের পরিণতি কী হতে যাচ্ছে), আর আল্লাহ তা'আলা ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৪)

আপনাদের উসীলায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঈমান দিয়েছেন, আপনারা আমাকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে চিনিয়েছেন। আমি যা করেছি তা তো আল্লাহ তা'আলার হুকুম আর তাঁর রাসূলের তরীকা ও সুন্নত, তাঁর যিন্দেগীর আদর্শ।

আপনাদের সন্তান হিসেবে যেভাবে আপনাদের খেদমত করার কথা ছিল, সেভাবে খেদমত করতে পারিনি। আজীবন আপনারা আমার জন্য কষ্ট করে গিয়েছেন। আজীবন আপনাদের থেকে খেদমত নিয়েছি। কিন্তু জীবনে আপনাদের তেমন কোনো খেদমত করতে পারিনি, আপনাদের সুখের জন্য তেমন কিছুই করতে পারিনি। আপনাদের অনেক আশা ও স্বপ্ন ছিল, আপনাদের সন্তান অনেক বড় মানুষ হবে, পড়াশুনা শেষ করে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হবে, জায়গা-জমি ক্রয় করে বাড়ি করবে, গাড়ি করবে, নাতি নাতনীদের নিয়ে সুখ-শান্তিতে বসবাস করবে আর আপনারা আপনাদের সন্তানকে নিয়ে গর্ব করবেন। আহ্! আমি তো পারলাম না আপনাদের সে স্বপ্ন-কে বাস্তবায়ন করতে, আপনাদের চোখে-মুখে হাসি ফুটাতে, আপনাদের সারাজীবনের কষ্টকে ফলপ্রদ করতে।

বলুন মা! আমি কিভাবে আপনার স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করব যখন দেখি, লাখো মায়ের স্বপ্নগুলোকে হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রিস্টান-ইহুদী-নাস্তিক-মুরতাদরা পদদলিত করে অঙ্কুরে হত্যা করছে?

বলুন বাবা! আমার রক্তে কেন আগুন জ্বলবে না, যখন দেখি লাখো বোনের সম্ভ্রম নিয়ে জারজের বাচ্চারা তামাশা করছে, ছিনিমিনি খেলছে? এসব দুনিয়ার ডিগ্রি-চাকরী-ব্যবসার কী মূল্য আছে আল্লাহ তা'আলার কাছে, যদি আমি আল্লাহর জন্য নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে না পারি, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মেহনত করতে না পারি?

হ্যাঁ, দুনিয়াতে আপনাদের স্বপ্ন আমি বাস্তবায়ন করতে পারিনি, তাই বলে কখনো আপনাদের মুখে হাসি ফুটাতে পারবো না এমনটি নয়। আশা করি, আমার রব আমাকে ব্যর্থদের অন্তর্ভূক্ত করবেন না, না-কামিয়াব করবেন না। হাদীসে এসেছে, একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তর জন সদস্যদের জান্নাতে নেয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করবে। আপনারা দুআ করেন যেন আমি তাদের শামিল হতে পারি। তাহলে, ইনশাআল্লাহ, কথা দিলাম, আপনাদেরকে

ছেড়ে আমি কখনোই জান্নাতে যাবো না। আপনারা আমার জন্য এতো কষ্ট করেছেন, আর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আপনাদের শুধু কষ্টই দিয়ে গিয়েছি, আর মৃত্যুর পর আমি একাকী সুখ ভোগ করবো আর আপনারা মৃত্যুর পরও কষ্ট করবেন, এটা কখনোই হতে পারেনা। ইনশাআল্লাহ, আমার রব কখনোই আপনাদের দুটি কষ্টকে একত্র করবেন না।

আপনারা গর্বিত হোন এজন্যে যে, আপনারা এমন কোনো কাপুরুষকে জন্ম দেন নি, যে জিহাদের তপ্ত ময়দানের লু হাওয়ার চেয়ে ঘরে বসে স্ত্রীর আঁচলে লুকিয়ে থাকাকে বেশি পছন্দ করে।

আপনারা এজন্য গর্ববোধ করুন যে, আপনারা এমন এক সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুসান্না বিন হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত তারিক বিন যিয়াদ রহ., হযরত সালাউদ্দিন আউয়ুবী রহ., হযরত সাইফুদ্দিন কুতয. রহ., হযরত মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহ., হযরত ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ., হযরত উসামা বিন লাদেন রহ. এর পদাঙ্ক অনুসারী।

আপনারা আমার জন্য দুআ করুন যেন আমি তাদের কাতারে শামিল হতে পারি।

জনম দুখী মা আমার!

একজন মা-ই জানেন তার বুক খালি হওয়ার কষ্ট কী! আপনার বুক খালি করে আমি চলে যাচ্ছি। অনন্তের পথে বিদায় নিচ্ছি। জানিনা, দুনিয়াতে আর কখনো আমাদের দেখা হয় কিনা!

আপনাকে সান্তনা দেয়ার ভাষা আমার নেই, মা! দয়া করে আপনি পরকালের লাভের আশায় ধৈর্য ধরুন। আপনি আমার কামিয়াবীর জন্য দুআ করবেন, যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে ময়দানে দৃঢ়পদ রাখেন, কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ধ্বংস না হয়ে যাই, মৃত্যুকে যেন কখনো ভয় না পাই। হয়তো শরীয়ত, নয়তো শাহাদাত- এ দুটোর একটা যেন অবশ্যই আমি লাভ করতে পারি। আমিও আপনাদের জন্য সবসময় দুআ করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ।

চির স্নেহময় বাবা আমার!

আপনার কাছ থেকেও বিদায় নিচ্ছি। হয়তো এরপর আপনাদের সাথে আর কখনো দেখা বা কথা নাও হতে পারে। ইনশাআল্লাহ হাশরের ময়দানে আবার দেখা হবে এবং জান্নাতে আমরা আবারো একসাথে বাস করব। তখন আপনাদেরকে আমি আর কষ্ট দিব না, কথা দিচ্ছি। আমার পক্ষ থেকে আমার ভাই-বোনদের সালাম দিবেন। তাদের কাছ থেকেও আমি বিদায় নিচ্ছি।

আপনাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে খুব ভালো রাখুন, ইজ্জত ও সম্মানের সাথে রাখুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

ইতি-

আপনাদের অতি আদরের সন্তান।

হতে

দাবানল

১৩০০ বছর পূর্বের কথা.....

ঘটনা ০১:

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে ৯০ হিজরি সনে একটি আরব বণিক কাফেলা সরনদ্বীপ (সিলন/বর্তমান শ্রীলংকা) থেকে আঠারটি জাহাজে করে ইরাকে ফিরছিল। পথিমধ্যে সিন্ধুর দেবল বন্দর (বর্তমানে পাকিস্তানের করাচী) অতিক্রম করার সময় একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দস্যুরা জাহাজগুলোকে লুট করে ও মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের দেবলে নিয়ে কারাগারে আটকে রাখে।

তৎকালীন সময়ে হিন্দুস্তানের সিন্ধু অঞ্চলের হিন্দু রাজা ছিল দাহির। এই ঘটনার পিছনে দাহিরের সরাসরি মদদ ছিল। সে মুসলিম নারী ও শিশুদের উপর যুলুম নির্যাতন করে। যার প্রেক্ষিতে মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে জাত্যাভিমানী এক মুসলিম বোন হিন্দুস্তান থেকে নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে একটি শ্বেত রুমালের উপর এক ঐতিহাসিক চিঠি লিখেন; চিঠিটি লিখে তৎকালীন বসরার শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বরাবর প্রেরণ করেন। চিঠিটি ছিলো এই-

"দূতের মুখে মুসলমান শিশু ও নারীদের বিপদের কথা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বসরার শাসনকর্তা স্বীয় সৈন্য বাহিনীর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সৈনিককে অশ্ব প্রস্তুত করার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন। সংবাদ বাহককে আমার এ পত্র দেখাবার প্রয়োজন হবে না। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের রক্ত যদি শীতল হয়ে জমে গিয়ে থাকে তবে হয়তো আমার এই পত্রও বিফল হবে। আমি আবুল হাসানের কন্যা। আমি ও আমার ভাই এখনো শত্রুর নাগালের বাইরে। কিন্তু আমাদের অন্য সমস্ত সঙ্গী এখন শত্রুর হাতে বন্দী- যাদের বিন্দুমাত্র দয়া নেই। বন্দীশালার সেই অন্ধকার কুঠুরীর কথা কল্পনা করুন- যেখানে বন্দীরা মুসলিম মুজাহিদদের অশ্বক্ষুরের শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ ও অস্থির হয়ে আছে।

আমাদের জন্য অহরহ সন্ধান চলছে। সম্ভবতঃ অচিরেই আমাদেরকেও কোনো অন্ধকার কুঠুরীতে বন্দী করা হবে। এও সম্ভব যে, তার পূর্বেই আবার যখন আমাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিবে, আমি সে দূরদৃষ্ট হতে বেঁচে যাব। কিন্তু মরবার সময় আমার দুঃখ থেকে যাবে যে, যেসব ঝঞ্ঝা-গতি অশ্ব তুর্কিস্তান ও আফ্রিকার দরযায় ঘা মারছে, স্বজাতির এতীম ও অসহায় শিশুদের সাহায্যের জন্য তারা পৌঁছতে পারল না! এও কি সম্ভব, যে তলোয়ার রোম ও ইরানের গর্বিত নরপতিদের মস্তকে বজ্ররূপে আপতিত হয়েছিল, সিন্ধুর উদ্ধত রাজার সামনে তা ভোঁতা প্রমাণিত হলো। আমি মৃত্যুকে ভয় করিনা। কিন্তু হাজ্জাজ, তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে আত্মমর্যাদাশীল জাতির এতীম ও বিধবাদের সাহায্যে ছুটে আস।"

-নাহীদ,

আত্মাভিমানী জাতির এক অসহায়া কন্যা। (ইন্টার্নেট থেকে সংগৃহীত)

চিঠিটি পড়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খঞ্জর বের করে তার অগ্রভাগ সিন্ধুর মানচিত্রে বিদ্ধ করে বললেন- আমি সিন্ধুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি। এ ঘোষণা দিয়ে তিনি পুরো যুদ্ধের দায়িত্বভার তার নব বিবাহিত জামাতা এবং ভাতিজা মুহাম্মাদ বিন কাসিম আস্ সাকাফিকে দিলেন। এই চিঠির বার্তা পৌঁছে গেল প্রতিটি মুসলিম যুবকের দ্বারে দ্বারে। তাদের মাঝে জাগ্রত পৌরুষত্ব যেন বিস্ফোরিত হলো। মুসলমান এতীম শিশু ও নারীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী শুনে, জাত্যাভিমানী মুসলিম যুবকেরা সেদিন ঘরে বসে থাকতে পারেনি, নববধূদের রেখেই ছুটেছিলেন জিহাদের উত্তপ্ত ময়দানে। শিশুদের ক্রন্দনের আওয়ায যার কাছেই পৌঁছেছে সেই ইসরাফিলের শিঙ্গার মতো গর্জে উঠেছে আর সিন্ধু রাজা ও তার বাহিনীর জন্য আযরাঈল হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম মাত্র বার হাজার মুসলিম সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সিন্ধু অভিমুখে রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে অনেক অঞ্চল জয় করে অবশেষে ৯৩ হিজরীতে দেবল নগরী ও দেবল দুর্গ জয় করেন। আর উদ্ধার করেন মুসলমান নর-নারী আর শিশুদের ।

আল্লাহ তা'আলা এভাবে বীর মুজাহিদদের দ্বারা মুসলিম শিশু ও নারীদের উদ্ধার করলেন এবং বিজয় দিয়ে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বাহিনীকে প্রতিটি মুসলিম যুবকের জন্য দৃষ্টান্ত বানালেন, ইতিহাসে চির ভাস্বর করে রাখলেন।

ঘটনা ০২:

আব্বাসী খিলাফতের সময় বাইজান্টাইন সম্রাট থিওফেল (Theophilos) আব্বাসী রাষ্ট্রের সীমান্ত নগরী যিবাতরায় হামলা চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালানোর পাশাপাশি অনেক মুসলিম মা-বোনকে বন্দি করে নিয়ে যায়। জনৈক হাশিমি বোন রোমানদের হাতে বন্দি অবস্থায় 'হায় মু'তাসিম!' বলে চিৎকার করেছে, খলিফা মুতাসিম যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন, তখন সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ও অস্থির চিত্তে বলে উঠলেন, লাব্বাইক! আমি উপস্থিত আছি, হে আমার বোন। এরপর তিনি নফীরে আম-এর ঘোষণা দেন এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত নগরী 'আম্মুরিয়া'কে পঞ্চান্ন দিন অবরোধ করে রাখার পর মুজাহিদ বাহিনী তা জয় করে এবং অপহৃত হাশিমি মুসলিম বোনকে উদ্ধার করে।

১৩০০ বছর পর.....

ইরাকের আবূ-গারীব কারাগার থেকে ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা 'আমার এক বোন' ফাতিমা নূরের চিঠি:

"আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ -قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- اللَّهُ الصَّمَدُ-لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ-وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

"বল, তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তিনি কারো জাতও নন। তার সাথে তুলনীয় কোনো কিছুই হতে পারে না।" (আল-কুরআন, সূরা নং-১১২, "আল-ইখলাছ")

আমি আল্লাহ তা'আলার মহাগ্রন্থ থেকে এই সূরা পছন্দ করেছি, কারণ এই সূরাটি আমার উপর এবং আপনাদের সকলের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব ফেলে এবং সূরাটি একজন মুমিনের অন্তরে এক প্রকারের ভীতি সঞ্চার করে।

আল্লাহর রাহের আমার মুজাহিদীন ভাইয়েরা!

আমি আপনাদের আর কী বলব? আমি আপনাদের বলি: আমাদের গর্ভগুলো ঐসব বানর এবং শূয়োরের বাচ্চাদের সন্তান দ্বারা ভরে গেছে, যারা আমাদেরকে ধর্ষণ করেছে। কিংবা আমি আপনাদের বলতে পারি: তারা আমাদের দেহকে বিকৃত করেছে, লাঞ্ছিত করেছে, আমাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছে, এবং আমাদের গলায় ঝুলানো যে কুরআন ছিলো তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে।

আল্লাহু আকবার!

আপনারা কি আমাদের অবস্থা অনুধাবন করতে পারছেন না? এটা কি সত্য, আমাদের উপর যা ঘটছে তা আপনারা জানেন না? আমরা কি আপনাদের বোন নই? আগামীকাল (কিয়ামতের দিন আমাদের ব্যাপারে) আপনাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

কুখ্যাত আবুগারীব কারাগারে মা-বোনদের উপর নির্যাতনের একটি দৃশ্য। (সূত্র: ইন্টারনেট)

আল্লাহর কসম! আমাদের উপর কারাগারে এমন একটি রাত অতিবাহিত হয়নি, যাতে এই বানর ও শূয়োরেরা আমাদেরকে বিবস্ত্র করে তাদের উদ্ধত কামনা চরিতার্থ করতে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। আর আমরা ছিলাম সেই মুসলিম নারী, যারা তাদের সতীত্বকে আল্লাহর ভয়ে সবসময় হেফাযত করে রাখতাম।
আল্লাহকে ভয় করুন! তাদেরকে সহ আমাদেরকে হত্যা করুন। তাদেরকে সহ আমাদেরকে ধ্বংস করে দিন! আমাদেরকে ধর্ষণ করে মজা লুটার জন্য তাদের হাতে আমাদেরকে ফেলে রাখবেন না। আপনাদের এই কাজে আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলা খুশি হবেন। আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন। বাহিরে তাদের কামান এবং ট্যাংকে আক্রমণ না করে আবু গারীব কারাগারে আমাদের কাছে আসুন।
আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, আমি আপনাদের বোন (ফাতিমা)। তারা একদিনে আমাকে নয় বারের বেশি ধর্ষণ করেছে। আপনারা কি (আমাদের অবস্থাটা) বুঝতে পারছেন?

আমার জায়গায় আপনার কোনো এক বোনকে কল্পনা করুন। কেন আপনারা সকলে তা ভাবতে পারছেন না, অথচ আমি আপনাদের একজন বোন? আমার সাথে আরো তেরজন মেয়ে আছে, তাদের সকলেই অবিবাহিতা। তাদের সকলকে প্রত্যেকের চোখ এবং কানের সামনে ধর্ষণ করা হয়েছে। তারা আমাদেরকে নামায আদায় করতে দেয় না। তারা আমাদের দেহের পোশাক কেড়ে নিয়েছে, আমাদেরকে পরার জন্য কোনো কাপড় দেয় না।
আমি যখন এই চিঠিটি লিখছি, তখন একজন বোন আত্মহত্যা করেছে। তাকে নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে। একজন সৈন্য তাকে ধর্ষণ করার পর তার বুক এবং উরুতে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে। সৈন্যটি বোনটির উপর অবিশ্বাস্য রকম অত্যাচার করেছে। বোনটি কারাগারের দেয়ালে তার মাথা বার বার আঘাত করতে থাকে, যতক্ষণ না মৃত্যু এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

যদিও ইসলামে আত্মহত্যা নিষেধ, আসলে বোনটি কোনোভাবেই আর সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু আমি সেই মেয়েটিকে মাফ করে দিয়েছি। আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলাও তাকে মাফ করে দিবেন, কেননা তিনি তো পরম করুণাময়, অতিশয় ক্ষমাশীল।
ভাইয়েরা আমার! আমি আপনাদেরকে আবারো বলছি, আল্লাহকে ভয় করুন! তাদের সাথে আমাদেরকে হত্যা করুন, যেন আমরা শান্তি লাভ করি। আমাদেরকে সাহায্য করুন! আমাদেরকে সাহায্য করুন! আমাদেরকে সাহায্য করুন!"
(ইন্টার্নেট থেকে সংগৃহীত)

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-২৭
আবু গারীব কারাগার অধ্যায়
AP

প্রিয় ভাই!

চিঠিটি এখানেই শেষ। কিন্তু ফাতেমার মতো আমার লাখো মুসলিম বোনদের উপর ধর্ষণ ও নিযার্তন আজও শেষ হয়নি। আমার মা ও বোনদের উপর ধর্ষণ ও নির্যাতন এখনো চলছে, তা চলছে ফিলিস্তিনে, সিরিয়ায়, ইরাকে, ইয়েমেনে, চলছে চীনে, ভারতে, কাশ্মীরে, চলছে মায়ানমারে, ...

কেন জানেন?

কারণ, আমরা এখনো ঘরে বসে আছি! আমাদের মাঝে পৌরুষত্ব জাগ্রত হচ্ছে না! আমরা বোনের ডাকে 'অলী ও নাসির' হয়ে ময়দানে ছুটে যাই নি! আমরা জিহাদ করছি না! এমনকি জিহাদ করার জন্য এতটুকু প্রস্তুতিও নিচ্ছি না! আমরা আল্লাহকে ভয় করছি না! জাহান্নামের আগুনকে ভয় করছি না! নিজের আরাম-আয়েশ আর ফূর্তির যিন্দেগী ছাড়তে পারছি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু আমাদের তকদীর হয়ে যায়!................

...........হ্যাঁ ভাই! আমার বোনদের চিৎকার ও আর্তনাদে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে, কিন্তু আমার, আপনার কর্ণকুহরে পৌঁছছে না! তাইতো আল্লাহ তা'আলা আহ্বান করছেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴿٧٥﴾

"আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে যালেম, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (৪ সূরা নিসা: ৭৫)

إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"তোমরা যদি (আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য) না বের হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৯)

كَيْفَ الْقَرَارُ وَكَيْفَ يَهْدَأُ الْمُسْلِمٌ * وَالْمُسْلِمُاتُ مَعَ الْعَدُوِّ الْمُعْتَدِىْ

اَلضَّارِبَاتُ خُدُوْدَهُنَّ بِرَنَّةٍ * اَلدَّاعِيَاتُ نَبِيَّهُنَّ مُحَمَّد

اَلْقَائِلَاتُ إِذَا خَشِيْنَ فَضِيُحَةً * جُهْدَ الْمُقَالَةِ لَيْتَنَا لَمْ نُوَلّدُ

مَا تَسْتَطِيْعُ وَمَا لَهَا مِنْ حِيْلَة * إِلّا التَّسَتُّرُمِنْ أَخِيهَا بِالْيَد

কিভাবে একজন মুসলিম স্থিরচিত্তে বসে থাকতে পারে, যখন মুসলমান নারীগণ শত্রু পরিবেষ্টিত?

যারা তাদের গাল চাপড়িয়ে কাঁদে এবং তাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে ডাকে।

যখন তাদের সম্ভ্রম বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন তারা অস্থির হয়ে বলে, হায়! আমরা যদি ভূমিষ্টই না হতাম!

তারা এতই অসহায় যে, শত্রুর কবল থেকে হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ)

গাযওয়াতুল হিন্দের ডাক:

প্রিয় ভাই! কিয়ামতের আগে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদীদের সাথে তাওহীদবাদীদের এক ভয়ানক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হবে, হাদীসের ভাষায় একে 'গাযওয়াতুল হিন্দ' বলা হয়। যে সকল ভাইয়েরা হিন্দুস্তান তথা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে আছেন, তাদেরকে বলছি! এই উপমহাদেশে মালাউন হিন্দুত্ববাদীদের দৌরাত্মের কথা একটু চিন্তা করি।

মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন আজকের নতুন কথা নয়। সে ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ঐতিহাসিকভাবেই হিন্দুত্ববাদীদের হাতে মুসলিমরা নির্যাতিত হয়ে আসছে। আর এমনটি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক!!

কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

"মানবজাতির মধ্যে তুমি ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে।" (সূরা মায়েদা ৫:৮২)

প্রশ্ন হল, কেন হিন্দুস্তানে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক দিন দিন অবনতি হচ্ছে?

তার উত্তর হচ্ছে-

ক. হিন্দু-জাতীয়তাবাদী দলগুলির বিস্তার, যেগুলি "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের" তথা আরএসএস- এর রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বা তার অধীনে কাজ করে। আরএসএস ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), ভারতীয় হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি), বজরং দল, ইসকন (ISKCON) ইত্যাদি।

খ. হিন্দুত্ববাদীদের চরম মাত্রার ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ।

গ. উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা, যার একটি বিশেষ রূপ হল হিন্দুত্ববাদী 'অখণ্ড ভারত' তথা 'রাম-রাষ্ট্রে'র দাবী উত্থাপন, যার মাধ্যমে মুসলিম নিধনের উন্মাদনা দানা বাঁধতে থাকে। ফলে তারা প্রকাশ্যে মুসলিম গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের জন্য আহ্বান জানাতে শুরু করে।

আগস্ট ১৪, ২০২১ ভারতের মানচিত্রে বাংলাদেশকে যুক্ত করে পাশের মানচিত্রটি (দুটি শ্লোগানসহ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেইসবুকে পোস্ট দেয় মালাউন দিলীপ ঘোষ নামের এক বিজেপি নেতা। (লিংক: https://bit.ly/dilipmap)। তাতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শীলঙ্কা, মিয়ানমারের মতো ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন দেশগুলোকে ভারতের অংশ হিসেবে দেখানো হয়। এমনকি, মুসলিমদের নীরবতা আর দূর্বলতার সুযোগে মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা এতটাই উন্মাদ ও আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে যে, মুসলিমদের সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে 'হিন্দু রাষ্ট্রের' নতুন 'সংবিধান' পর্যন্ত

তৈরী করে ফেলেছে তারা। হিন্দু রাষ্ট্রের সংবিধানের খসড়া অনুসারে, অহিন্দুরা বিশেষতঃ মুসলিমরা তথাকথিত ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। [https://bit.ly/3AvWrZM]

অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্রের সংবিধান তৈরি করেছে মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা

পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশগুলোকে বিশেষত বাংলাদেশকে স্বাধীন সিকিম কিংবা হায়াদ্রাবাদের মত গিলে ফেলার খোয়াব দেখছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা। তাদের এই খোয়াবই ঠিক করে দেয় বাংলাদেশসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে তার আচরণবিধি আর পররাষ্ট্রনীতি।

ঘ. হিন্দুত্ববাদী নেতৃবৃন্দের উস্কানীমূলক বক্তব্য:

ভারতের কংগ্রেস নেতা হিন্দুত্ববাদী ডক্টর মুনজী হিন্দু মহাসভার **১৯২৩** সালের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ঘোষণা দেয়, "ইংল্যান্ড যেমন ইংরেজদের, ফ্রান্স যেমন ফরাসীদের, জার্মানী যেমন জার্মানদের, তেমনি ভারতও হিন্দুদের।"

হিন্দুত্ববাদী মহারাষ্ট্র নেতা বালগংগাধর তিলক, তার রায়গড় বক্তৃতায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেয়, "এ উপমহাদেশে মুসলিমরা হচ্ছে বিদেশী লুটেরা। সুতরাং তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।"

'ধর্ম সংসদ' এর অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা মালাউন যতি নরসিংহানন্দ ঘোষণা করে, "মুসলিমদেরকে হত্যা করার জন্য তরবারি যথেষ্ট নয়। আমাদের তরবারির চেয়েও ভাল অস্ত্র চাই।"

মালাউন প্রবোধানন্দ গিরি মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের জাতিগত নিধনের উদাহরণ দিয়ে ঘোষণা করে, "সময় আর বাকি নেই। এখন কেবল দুটো অপশন আছে। হয় নিজেরা মরার জন্য তৈরি হও অথবা মুসলিমদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। এছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। এ কারণে এখানেও (ভারতেও) মিয়ানমারের মত স্থানীয় পুলিশ, রাজনীতিবিদ, সেনাবাহিনী এবং প্রত্যেক হিন্দুর জন্য উচিত হল, তারা অস্ত্র বহন করবে এবং উচ্ছেদ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এছাড়া সমাধানের কোনো পথ নেই।"

হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারি পূজা শাকুন পান্ডে নামক নারী মুসলিমদেরকে গণহারে হত্যার প্রকাশ্য আহ্বান জানিয়ে বলে,"অস্ত্র ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। আপনাদের যদি তাদের (মুসলিমদের) জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করতে হয়, তাদের হত্যা করুন। তাদের হত্যা করতে প্রস্তুত হন এবং জেলে যেতে প্রস্তুত হন। যদি আমাদের মাত্র ১০০ সৈন্যও থাকে এবং তাদের ২০ লাখকে যদি আমরা হত্যা করি, আমরা বিজয়ী হব।"

আরেক হিন্দুত্ববাদী মালাউন আনন্দস্বরূপ হিন্দুদেরকে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য উৎসাহিত করে বলে, "আমি বারবার বলছি, যদি মোবাইল প্রয়োজন হয় তাহলে ৫০০০ রাখ, কিন্তু অস্ত্রের জন্য খরচ কর ১ লাখ রুপি।"

ফলাফল:

উপর্যুক্ত কারণসমূহের অনিবার্য ফলাফল হিসেবে হিন্দুস্তানে একের পর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এগুলোর মধ্যে ১৯৪৬ এর কলকাতা ম্যাসাকার, ১৯৪৭ এর দেশ বিভাজনের সময় মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের গণহত্যা, ১৯৪৭ সালে জম্মুতে মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ, হায়দরাবাদে অপারেশন পোলোর পরে মুসলমানদের ব্যাপকহারে হত্যা, ১৯৫০ সালে বরিশাল দাঙ্গা ও ১৯৬৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তান দাঙ্গার পরে কলকাতায় মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৬৯ সালের গুজরাট দাঙ্গা, ১৯৮৪ ভীভান্দি দাঙ্গা, ১৯৮৫ গুজরাত দাঙ্গা, ১৯৮৯ সালের ভাগলপুর দাঙ্গা, বোম্বাই দাঙ্গা, ১৯৮৩ সালে নেলি, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর 'বাবরি মসজিদ' শহীদ করার পর পরিচালিত দাঙ্গা এবং ২০০২ সালে গুজরাতের দাঙ্গা, ২০১৩ সালে মুজাফফরনগর দাঙ্গা ও ২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গা ইত্যাদি। তাছাড়া যুগ যুগ ধরে চলমান কাশ্মিরী মুসলিমদের উপর চলমান আগ্রাসন ও গণহত্যা তো রয়েছেই।

চিত্র: মালাউন গেরুয়া সন্ত্রাসী।

এসকল দাঙ্গায় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের শহীদ করে দেয়, মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করে, আগুনে পুড়িয়ে মারে। শত শত বালিকা ও মহিলাদের গণধর্ষণ করা হয় এবং পরে তাদের পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। বাচ্চাদের জোর করে পেট্রোল খাওয়ানো হয় এবং তারপরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গর্ভবতী মহিলাদের আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। মহিলাদের পেটে অনাগত সন্তানের পোড়া দেহ দেখা যাচ্ছিল। উগ্র হিন্দুরা মুসলমানদের অনেক বাড়ি ঘেরাও করে এবং ঘরের পুরো পরিবারকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে। মহিলাদের উলঙ্গ করে ধর্ষণ করেছিল এবং হত্যা

করেছিল। মহিলাদের পেট চিরে নবজাতক বের করে ত্রিশুলের আগায় গেঁথে আনন্দ মিছিল করেছিল হিন্দুরা। পিতার সম্মুখে তার সন্তানকে হত্যা আর মায়ের সম্মুখে তার মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

প্রিয় ভাই! এই হল মালাউন হিন্দুত্ববাদীদের আসল চেহারা। তারা আমার আপনার প্রতি এমনই বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে থাকে। হিন্দুত্ববাদী মালাউনদের সাথে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক একটি যুদ্ধ অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী। একটু ভাবুনতো, এরা যখন আপনার আমার ঘরে ঢুকবে 'অখণ্ড ভারত' আর 'রামরাজত্ব' কায়েম করার মিশন নিয়ে তখন আমাদের সাথে এরা কেমন ব্যবহার করবে, কেমন আচরণ করবে আমাদের সন্তানদের সাথে, আমাদের মা-বোনদের সাথে???

গাযওয়াতুল হিন্দের পথে হিন্দুত্ববাদীরা:

প্রিয় ভাই! ১৪০০ বছর পূর্বে প্রিয়নবী ﷺ শেষ যামানায় হিন্দুস্তানের হিন্দুত্ববাদী কর্তৃক মুসলমানদের উপর এক প্রলয়ঙ্করী গণহত্যা ও মহাযুদ্ধের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বানী করে গিয়েছেন। সেটিকে হাদীসের ভাষ্যমতে 'গাযওয়াতুল হিন্দ' বলা হয়। পুরো হিন্দুস্তান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা এই যুদ্ধের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে আমরা দেখতে পাই, শিশু-কিশোর ও পূর্ণবয়স্কদের নানা জায়গায়- স্কুলে, গ্রামের ক্ষেত-খামার ও ময়দানে, এমনকি এয়ার কন্ডিশন কনফারেন্স রূমে- লড়াই করা, হত্যা করা, অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুবরণ করা এবং শত্রুকে হত্যা করার মর্মে শপথ করানো হচ্ছে। এমনিভাবে মুসলিমদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে বয়কট করারও অঙ্গীকারু করানো হচ্ছে। মুসলিমদের সঙ্গে সর্বপ্রকার লেন-দেন পরিহার করার কথাও বলা হয়। এমনকি পার্লামেন্টের কতক সদস্য পর্যন্ত মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা অথবা তাদেরকে এলাকা থেকে মেরে পিটিয়ে বের করে দেয়ার উপর জোরারোপ করে।

এককথায়, মুসলিম বিদ্বেষ বর্তমানে থার্মোমিটারের সর্বোচ্চ পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে। ভয়াবহ 'ইসলামোফোবিয়া' গোটা হিন্দুস্তানের সমাজে ছড়িয়ে গিয়েছে।

ভারতের সকল স্তরের মালাউন যুবকেরা হিন্দুত্ববাদীদের জাতিগত নিধনের বিরাট প্রকল্পে পুরোপুরি অংশ নিচ্ছে, তারা অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, শারীরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

মুসলিমদেরকে বিশেষত মুসলিম মা-বোনদেরকে পশুর চেয়েও অধম প্রমাণ করায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে, নানাভাবে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও কটাক্ষ করছে। তারা মুসলিমদেরকে মানবিক গুনাবলী থেকে অবমুক্ত করে 'জন্তু-জানোয়ার' থেকেও নিকৃষ্ট আখ্যা দিচ্ছে। বিজেপি ও আরএসএস কর্মীরা দীর্ঘদিন যাবত মুসলিমদেরকে বোঝানোর জন্য 'উইপোকা' ট্যাগ ব্যবহার করছে; যারা নাকি ভারতের সম্পদ নষ্ট করছে এবং মালাউন হিন্দুত্ববাদীদেরকে তাদের ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

বিভিন্ন মোবাইল এ্যাপ্স, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়াতেও হিন্দুত্ববাদীরা নির্বিঘ্নে ও খোলাখুলিভাবে মুসলিম সাধারণ যুবকদের হত্যা করা এবং মুসলিম মা-বোনদের সঙ্গে দলগত অনাচারের আহ্বান জানাচ্ছে। এমনকি, হিন্দু যুবকরা মুসলিম সেজে মুসলিম বোনদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদের সতীত্ব নষ্ট করছে, কিংবা পাচার করে দিচ্ছে, অনেককে হত্যা করছে। এটি 'গেরোয়া লাভ ট্র্যাপ' নামে পরিচিত।

সাধারণ মুসলিমদেরকে 'জিহাদী' ট্যাগ দিচ্ছে। তাদেরকে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করছে। গরু জবাই করার অপরাধে মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা করছে।

এছাড়া সরকারিভাবেও বিজেপি, আরএসএস এর লক্ষ লক্ষ কর্মী ও সমর্থক অত্যন্ত দক্ষভাবে নানা প্রোপাগান্ডা তৈরি করছে। অত্যন্ত সুনিপুণ ও সংগঠিতভাবে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। তাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো ও গণহত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাঠ প্রস্তুত করা হচ্ছে। বলিউড মুভি আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে হিন্দুদের ব্রেইন ওয়াশ করছে, জাতিগত নিধনের পালে হাওয়া দিয়ে এই আহ্বানকে ব্যাপক করা হচ্ছে।

এককথায়, মুসলিমদের ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে জাতিগত নিধনের পরিকল্পনা সফল করার জন্য তৃণমূল থেকে শুরু করে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত, অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদী সমাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুনিপুণ ও গভীরভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

তারা তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে আমাদেরকে এই বার্তাই দিচ্ছে যে, হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের জাতিগত নিধনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত মনে করছে। তারা অতি শীঘ্রই এই মহা হত্যাযজ্ঞের চূড়ান্ত অংশকে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

(ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের সর্বশেষ আপডেট পেতে Tor Browser দিয়ে ভিজিট করুন-
লিংক 01: https://bit.ly/3PXKzWd
লিংক 02: https://gazwah.net/?cat=634
লিংক 03: https://dawahilallah.com/)

ভারতীয় মুসলিমদের জন্য "জেনোসাইড ইমারজেন্সি এলার্ট"

জেনোসাইড ওয়াচ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর গ্রেগোরি এইচ্ স্ট্যান্টোন (Gregory H Stanton) জাতিগত নিধনের দশটি পর্যায় বিন্যাস করেছেন। (https://bit.ly/3R1usZ0)

তার মতে, "ভারত জাতিগত নিধনের অষ্টম স্তরে পৌঁছে গেছে। তা হল পশ্চাদ্ধাবন ও নির্যাতন-নিপীড়নের স্তর। (এর পরের ধাপই মূলোচ্ছেদ তথা পরিকল্পিত সংঘবদ্ধ গণহত্যা করা, যাতে উক্ত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সার্বিকভাবে নিশ্চিহ্ন করা যায়।)

১০ ই জানুয়ারি ২০২২ এ তারা ভারতের জন্য জেনোসাইড ইমারজেন্সি এলার্ট জারি করে। একটি অনলাইন কনফারেন্সে সকলকে সম্বোধন করে বলে যে, "ভারত আজকে অষ্টম স্তরে পৌঁছে গেছে। নিজেদের টার্গেট গ্রুপ তথা মুসলিমদেরকে চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদের স্তরে যেতে তাদের কেবল এক কদম দূরত্ব রয়েছে।"

এককথায়, হিন্দুত্ববাদী বাহিনী মুসলিমদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলার জন্য দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে।

(ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম নিধনের বিভিন্ন পর্যায়: https://bit.ly/3CEdjQL ;
হিন্দুস্তান ক্রমাগত ধ্বংসের পথে: https://bit.ly/3qNUjbv)

হায়! আমাদের প্রস্তুতি কোথায়?

প্রিয় ভাই! এই 'মহাবিপর্যয়' প্রতিরোধের জন্য আমার আপনার প্রস্তুতি কতটুকু??? হিন্দুত্ববাদীরা যখন আমাকে আপনাকে, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যার প্রকাশ্য ঘোষণা দিচ্ছে, আমাদের মা-বোনদের ইজ্জতের উপর আক্রমণের সর্বাত্মক প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছে, সেখানে আমি আপনি এই মহাপ্রলয় প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করেছি কি?

বাংলা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত, আসাম থেকে দিল্লী পর্যন্ত, গুজরাট থেকে অযোদ্ধা পর্যন্ত, আমাদের দৃষ্টির সামনে চলমান হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন, যেখানে প্রতিনিয়ত লক্ষ হাজার মুসলিমের তাজা খুন ঝরছে, যেখানে লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত হানি করা হচ্ছে, হিন্দের ভূমি থেকে মুসলিমদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে, মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করার মিশন এগিয়ে যাচ্ছে সীমাহীন গতিতে, এর বিপরীতে আমাদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা আশানুরূপ এগিয়েছে কি?? হায়! আমাদের গাফলতি, আমাদের অলসতা দেখে হয়ত শয়তানেরও হাসি পায়!! কবি বলেন-

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم   يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

আল্লাহর দ্বীনের লক্ষ্য কি এটাই যে, তোমরা নিজেদের গোঁফ ছাঁটাই করবে,

হে জাতি! তোমাদের অজ্ঞতায় অন্যান্য জাতিরা হেসেছিল!!

প্রিয় ভাই! একটু চিন্তা করুনতো- যদি পাড়ার কোনো মাস্তান আপনাকে হত্যার হুমকি দেয়; আপনার আদরের সন্তানকে জবাই করার ঘোষণা দেয় বা আপনার অতি স্নেহের কন্যা সন্তানকে অপহরণ করে ধর্ষণের বার্তা পাঠায়; অথবা আপনার পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে ধর্ষণ করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার পরিকল্পনার কথা আপনি কোনোভাবে জেনে যান; কিংবা ধরুন আপনি জানতে পারলেন যে, এলাকার বখাটে লোকজন বা আপনার কোনো এক শত্রু আগামীকাল আপনার বাড়ি আক্রমণ করে আপনার সারাজীবনের কষ্টে গড়া বাড়িটি বোলডোজার দিয়ে ভেঙে দিবে বা আগুন জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে; এবং আপনি দেখলেন যে, আপনার দুশমন সেই দুষ্কৃতিকারীগণ আপনার উপর হামলা করার জন্য আপনার চোখের সামনেই প্রস্তুতি নিচ্ছে, আপনাকে হত্যার সরঞ্জাম আপনার চোখের সামনে দিয়েই সংগ্রহ করছে, ও আমার ভাই, আপনি তখন কী করবেন??? একটু চিন্তা করে জবাব দিন।

আপনি কি তখন এটা চিন্তা করবেন, যা হবার আগে হোক, যা কিছু ঘটার আগে ঘটুক, আগে আক্রমণ হোক পরে দেখা যাবে; নাকি ভাববেন, আরে ধুর, এগুলো নিছক হুমকি-ধমকি, ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না; নাকি ভাববেন, আমার শাইখ, আমার পীর, কিংবা আমার উপর যত উলামায়ে কেরাম আছেন তারা যখন বলবেন -তুমি এ বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করো, তখন আমি এ বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবো। না! ভাই এগুলোর একটাও তখন আমি বা আপনি কেউ করবো না।

তাহলে তখন কী করব?? হয়তো আত্মগোপন করব, নতুবা পুলিশকে খবর দিব, থানায় জিডি করব, পরিবার পরিজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলব ইত্যাদি। এককথায় এই বিপদ থেকে বাঁচার বা মোকাবিলা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো।

তাহলে ভাই!

আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা আমাকে, আপনাকে হত্যা করার জন্য প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে? আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা কেবল আমাকে আর আপনাকেই নয়, আমাদের সন্তান-সন্তুতি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের সকল মুসলমান নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ

সকলকেই হত্যা করে 'জাতিগত নিধনের' মাধ্যমে হিন্দুস্তানের মাটি থেকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে চাচ্ছে?? মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা ইতোপূর্বে আমাদের মা-বোনদের সাথে কেমন আচরণ করেছিল সেকথা কি আমরা ভুলে গিয়েছি?? তারা কি এখন এর চেয়ে উত্তম আচরণ করবে আমাদের শ্রদ্ধেয় মা-বোনদের সাথে, আমাদের নয়নের মণিদের সাথে???

আমরা কি আমাদের চোখের সামনে মালাউনদের প্রস্তুতি গ্রহণ করার দৃশ্য দেখছি না??? আফসোস! আমাদের প্রস্তুতি কোথায়??? কোনরূপ প্রস্তুতি ছাড়া আমরা কিভাবে এই প্রলয়ঙ্করী আগ্রাসনের মোকাবেলা করব ভাই???

আমরা কি ভাবছি, আগে আক্রমণ হোক, পরে দেখা যাবে, বা পরে জিহাদ করব?? কেন ভাই এই আত্মপ্রবঞ্চনা??? কেন ভাই নিজেকে এই ধোঁকা দেওয়া??? প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধ জয় হয়, এমন কথা শুনেছেন কোথাও?? এটা তো আল্লাহ পাকের সুন্নাহ না!!!

নাকি আমরা ভাবছি, গাযওয়াতুল হিন্দ অনেক দূরে, বহু দূরে, কমপক্ষে আমার জীবদ্দশায় আমি পাব না???

ভাই, একটি যুদ্ধ বাঁধতে কি হাজার বছর সময় লাগে, নাকি শত বছর??

সত্তর বছরের আগের ফিলিস্তিনের কথা চিন্তা করুন; চিন্তা করুন, সেসময়ের মুসলিমদের দুনিয়াদারীর কথা। সেই রঙিন স্বপ্নগুলো আজ কোথায়?? অভিশপ্ত ইহুদীবাদের আগ্রাসন নিমিষেই কি সব শেষ করে দেয়নি???

বেশি দূর যাবার দরকার নেই। বিশ বছর আগের ইরাক কিংবা সিরিয়ার কথাই স্মরণ করুন। কোথায় গেল তাদের ক্যারিয়ারের স্বপ্ন, 'সোনার হরিণ' একটি চাকুরির অভিলাষ, কোথায় গেল শহরের একটি ফ্ল্যাট কিংবা একটি বাড়ির জন্য আজীবনের সাধনা??? সব কিছুই কি এক পলকেই নিঃশেষ হয়ে গেল না??? ক্রুসেডার আক্রমণের মুখে সকল স্বপ্নই কি দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হয়ে গেল না?? আর এগুলো হতে কি হাজার বছর সময় লেগেছে, নাকি শত বছর?? কয়েক দিন আগের সাজানো গোছানো ফিলিস্তিন, ইরাক, সিরিয়া চোখের পলকেই কি জাহান্নামে রূপ নেয়নি??

আপনি কি বোন ফাতিমা নূর আর আফিয়া সিদ্দিকীর আর্তনাদ শুনেননি??

আমরা কি ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস পড়িনি?? জিহাদী দুর্বলতার সুযোগে যুগে যুগে আমরা কিভাবে গণহত্যার শিকার হয়েছি??

হিন্দুস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে চুপচাপ বসে থাকা, জিহাদের প্রস্তুতি না নেয়া, 'গাযওয়াতুল হিন্দ'কে দুরবর্তী মনে করা 'অপরিণামদর্শিতা' ও 'অদুরদর্শিতা'র পরিচায়ক। এটা যেন সেই ডাহুকের অবস্থা, যে শিকারী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে চোখ বন্ধ করে রাখে, আর মনে করে, আমি যেহেতু কাউকে দেখছি না, বোধ হয় আমাকেও কেউ দেখছে না। আমরা যতই চুপচাপ বসে থাকি, বা জিহাদ থেকে হাত গুটিয়ে ছলনাময় আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে থাকি, হিন্দুত্ববাদীরা কিন্তু বসে নেই; তারা কিন্তু ঠিকই প্রতিনিয়ত 'গাযওয়াতুল হিন্দ' এর ডাক দিয়ে যাচ্ছে। তারা ইতোমধ্যেই মুসলিমদের উপর সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরু করে দিয়েছে, প্রতিদিনই ভারতের আনাচে কানাচে মুসলিমদেরকে হত্যা, গুম, অত্যাচার আর মা-বোনের সম্ভ্রমহানির খবর কানে আসছে।

বাংলাদেশে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানের' মাধ্যমে ০৫ আগস্ট, ২০২৪ ঈসায়ী তারিখ স্বৈরাচারী, ফ্যাসিস্ট, লেডি ফেরাউন, মোদির কেনা বান্দী শেখ হাসিনার পতন হয়। বাংলাশের অকুতোভয় ছাত্রসমাজের হাত ধরে এই আন্দোলন শুরু হয়ে অবশেষে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে বন্দুকের সামনে খালি হাতে বুক টান করে দাঁড়িয়ে জীবন উৎসর্গ করার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশের আবু সাঈদের মতো হাজারো ছাত্রজনতা। যেখানে বাংলাদেশকে দখল করার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছিল, এই অবস্থায় বাংলাদেশে দিল্লীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত এজেন্ট শেখ হাসিনার পতনে ভারতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ-ভারতের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, পারস্পরিক উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা বুঝতে পেরেছে, যুদ্ধ ছাড়া বাংলাদেশ দখলের আর কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। সম্প্রতি ভারতের স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রি রাজনাথ সিং বাংলাদেশের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য সে দেশের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। এদিকে বাংলাদেশের হিন্দুদেরকে ব্যবহার করে, বিশেষত ইসকন নামক সন্ত্রাসী সংগঠনকে ব্যবহার করে ভারত চাইছে বাংলাদেশে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে, বিশেষ করে একটি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধাতে। তারা তাদের পরিকল্পনায় সফল হলে হিন্দুদেরকে বাঁচানোর কথা বলে বাংলাদেশে আক্রমন করা তাদের জন্য সহজ হবে। বিশ্বকে তারা দেখাতে পারবে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, আফগানিস্তানের মত বাংলাদেশেও মৌলবাদীরা ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে। তাই হিন্দু নিধন চলছে। তাই হিন্দুদের বাঁচাতে বাংলাদেশে হামলা করতে হবে।

এহেন পরিস্থিতিতে আমরা বলতে পারি, গাযওয়াতুল হিন্দ আমাদের দোরগোড়ায় চলে এসেছে। (আল্লাহু আ'লাম) অন্যদিকে, আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছি।
হ্যাঁ ভাই, আমরা ঘুমাচ্ছি। আর আমরা যদি এখনো সচেতন না হই, তাহলে জেনে রাখুন, আমাদের এই অপ্রস্তুতির পরিণামে আমাদেরকে অবশ্যই হিন্দুত্ববাদীদের 'বলির পাঠা' হতে হবে। নিজেদের ধ্বংস নিজেদের চোখে দেখতে হবে। (আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।)

এখন প্রশ্ন হল, আমরা কিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করব বা কী প্রস্তুতি নিব???

হ্যাঁ ভাই, এখন আমাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আল আনফাল ০৮:৬০)

আর আমাদের জন্য এই শক্তি সঞ্চয়ের প্রথম ও প্রধান ধাপ হল- জামাতবদ্ধ হওয়া। এরপর জামাতবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকা। হিন্দুস্তানের সকল মুসলিমকে জিহাদের এক পতাকার নীচে চলে আসতে হবে, ইনশাআল্লাহ। এটাই এখন আসল কাজ। তাই আমাদেরকে মুজাহিদ ভাইদের সেই হক জামাত তালাশ করতে হবে, যারা এই মালাউনী আগ্রাসন থেকে উম্মাহকে বাঁচাতে দিনরাত ছটফট করছেন, যারা উম্মাহর মা-বোনের হেফাযতের জন্য দিন-রাতকে একাকার করে দিচ্ছেন, যারা এই হিন্দের ভূমিকে নাপাক শিরকমুক্ত করার মিশন নিয়ে দিবানিশি ফিকির ও প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন দুর্বার গতিতে, যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তির উপর ভরসা করে অহর্নিশি জনশক্তি ও অস্ত্রশক্তি বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আসুন! আমরা সততা ও সত্যবাদীতার সাথে সেই মোবারক কাফেলার সন্ধান করি এবং জুড়ে যাই। ভাইদের শক্তিবৃদ্ধি করি, ভাইদের জামাত ভারী করি, ভাইদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করি, নিজেদেরকে আল্লাহর সৈনিক হিসেবে পেশ করি, শাহাদাতের শপথ নেই। মুজাহিদ ভাইয়েরা আমাদের যেভাবে গড়ে তোলেন আমরা সেভাবে গড়ে উঠি। এটি এখন সময়ের নাজুকতার দাবী!
যারা এখনো হক জামাত তালাশ করে খোঁজে পাইনি তাদের করনীয় সম্পর্কে নিচের কিতাবটি পড়তে পারেন- কিতাবুত তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল, দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ; "তাহলে বর্তমানে আমরা কিভাবে জিহাদ করব বা জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত হবো?" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কিতাবের লিংক: https://bit.ly/tahrid2

প্রিয় ভাই, হিন্দুত্ববাদী মালাউনরা যদি 'মিথ্যা' ও চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাওয়ার জন্য নিজের জীবন বাজি লাগাতে পারে, মৃত্যুর শপথ নিতে পারে, তাহলে আমরা কেন 'সত্য' ও অনন্তকালের জান্নাতের জন্য মওতের বাইয়াত হতে পারবো না?
হ্যাঁ ভাই! যদিও আমরা প্রস্তুতির দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছি, তথাপি আমাদের হতাশ হবার কিছু নেই। সাধ্যমত সর্বাত্মক প্রস্তুতি চালিয়ে যেতেই হবে, ইনশাআল্লাহ। হতাশ হয়ে বসে পড়লে আমরা হেরে যাব। অন্যথায় শিরক ও তাওহীদের এই লড়াইয়ে বিজয় আমাদেরই হবে ইনশাআল্লাহ।

'গাযওয়াতুল হিন্দ' সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যদ্বানী:

রাসূলে আরাবী ﷺ চৌদ্দশত বছর আগেই এই যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বানী করে গিয়েছেন; শির্কপন্থীদের সাথে তাওহীদপন্থীদের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী, সর্বশেষ সিদ্ধান্তমূলক একটি যুদ্ধের। যার শেষ হবে- অভিশপ্ত হিন্দুদের হাত থেকে মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃক ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার, দিল্লীর লালকেল্লায় কালিমার পতাকা উড্ডয়ন আর ভারতবর্ষকে হিন্দু ও হিন্দুয়ানী শিরকমুক্ত করার মাধ্যমে। কিন্তু এর আগে হয়ত রক্ত দিতে হবে কোটি কোটি তাওহীদপন্থীদের, নাম লিখাতে হবে শেষ যামানার সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদদের খাতায়। ....

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হিন্দুস্থানের জিহাদের (ভারত অভিযানের) ওয়াদা দিয়েছেন। যদি আমি তা (ঐ যুদ্ধের সুযোগ) পাই, তা হলে আমি তাতে আমার জান-মাল ব্যয় করব। আর যদি আমি তাতে নিহত হই, তাহলে আমি শহীদের মধ্যে উত্তম সাব্যস্ত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি, তা হলে আমি হবো আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত আবূ হুরায়রা।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৭৩, ৩১৭৪)

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ :عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোলাম ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের দুটি দল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন। একদল যারা হিন্দুস্থানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)-এর সঙ্গে থাকবে।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৭৫)

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وذكر الهند: " يغزو الهند بكم جيش يفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفر الله ذنوبهم، فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم بالشام ".

- نعيم- كتاب كنز العمال - نزول عيسى عليه الصلاة والسلام-

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ হিন্দুস্থানের আলোচনায় বলেছেনঃ "তোমাদের একটি দল হিন্দুস্থানে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিজয় দান করবেন, এমনকি তারা সেখানের শাসকদেরকে গলায় বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন, অতঃপর তাদের ফিরে আসার সময় হলে তারা ফিরে আসবে ও শামে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে পাবে।" (সহীহ কানযুল উম্মাল)

সুতরাং প্রিয় ভাই! আর ঘুম নয়, এবার জেগে উঠার পালা। আল্লাহর রাসূলের সুসংবাদকে বুকে ধারণ করে শ্রেষ্ঠ শহীদ কিংবা শ্রেষ্ঠ গাজীর হওয়ার তামান্নায় কেবলেই এগিয়ে যাওয়ার পালা। সময় এখন শুধুই সামনে এগিয়ে যাওয়ার। গাযওয়াতুল হিন্দে 'আল্লাহর সৈনিক' হওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হোক এখন থেকেই.............

ওহে মুসলিম ভাই!

ওহে মুসলিম যুবক! ওহে ভাই!

ওহে ইসলামের সিংহপুরুষ!

ওহে আল্লাহর বাঘ!

ওহে আল্লাহর তরবারি!

জেগে উঠুন!

কিসের ভয়?

কিসের পিছুটান?

প্রস্তুতি গ্রহন করুন মহাযুদ্ধের!

প্রিয় ভাই!

আমাদের রক্ত কি খালিদ বিন ওয়ালিদের রক্ত নয়?

আমাদের রক্ত কি সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস, ইকরামা, মুসান্না আর আমর ইবনুল আস এর রক্ত নয়?

আমাদের রক্ত কি জাবের, যায়েদ আর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার রক্ত নয়?

আমরা কি মুআজ বিন জামূহ আর মুআজ বিন আফরাদের কথা ভুলে গিয়েছি?

আমরা কি তাদের সন্তান নই? (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাইন)।...........

ওহে একই উম্মাহর সহোদর ভাই আমার!

একটু ভাবুন তো-

আমাদের রক্ত কি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের রক্ত নয়?

আমরা কি দিগ্বিজয়ী সিপাহসালার কুতায়বা বিন মুসলিম আল বাহিলি কিংবা মাসলামা বিন আব্দুল মালিক আল মারওয়ানির সন্তান নই?

আমাদের রক্ত কি সালাহ উদ্দিন আউয়ুবীর রক্ত নয়?

আমাদের রক্ত কি নুরুদ্দিন জঙ্গীর রক্ত নয়?

আমাদের শিরায়-উপশিরায়, ধমনীতে কি তারিক বিন যিয়াদ, ইউসুফ বিন তাশফিনের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না?

আমরা কি কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ী মুহাম্মাদ আল ফাতিহর উত্তরসূরী নই?

আমরা কি সিন্ধু বিজেতা মুহাম্মাদ বিন কাসিমের প্রজন্ম নই? (রাহিমাহুমুল্লাহু আযমাঈন)।...................

আমরা কি সেই উম্মাহ নই, যারা ছিল প্রতাপশালী, বিশ্বজয়ী, সারা বিশ্বের রক্ষক ও পরিচর্যাকারী?

আমরা কি সেই মহাবীরদের সন্তান নই, যারা মাত্র তেইশ বছরে অর্ধপৃথিবী জয় করেছিল?

আমরা কি সেই একই উম্মাহর সন্তান নই?

যেই বীরাঙ্গনা মায়ের সন্তানেরা কিসরা-কায়সারের (পারস্য-রোম) সাম্রাজ্যকে লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়েছিল, আমরা কি সেই একই মায়ের সন্তান নই?

আমরা কি তাদের সন্তান নই, যারা অবজ্ঞাভরে পায়ে মাড়িয়েছিল পারস্যের মুকুটকে?

আমরা কি সেই একই উম্মাহর কোলে প্রতিপালিত হইনি?

সেই একই মায়ের ভালোবাসার আঁচলে কি আমরা বড় হয়ে উঠিনি?

হায়! পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া আমানত (খিলাফত)-কে আমরা আজ হারিয়ে ফেলেছি! ফলে আসমান থেকে পাতালপুরীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছি! জিহাদ ত্যাগ করে অপমান ও জিল্লতীর যিন্দেগী যাপন করছি। সারা দুনিয়ায় কুফ্ফারদের হাতে কেবল মার-ই খাচ্ছি!

হায়! এজন্য আমাদের হৃদয়ে কি আজ একটুও আফসোস হয়না?............

তাহলে কেন আমরা জেগে উঠছি না?

আমরা কি অনুভব করিনা, আসমানের সেই ঝরে পড়া তারাগুলোর মধ্যে আমরাও ছিলাম একেকটি তারকা? আমরাও তো হতে পারতাম পৃথিবীর শাসক, আমরাও হতে পারতাম দিগ্বিজয়ী সিপাহসালার! কেননা আমরা তো তাদেরই সন্তান, তারাই তো আমাদের পিতা!

কিন্তু হায়! আমাদের রক্ত আজ কেন এমন হিম শীতল হয়ে গেল?

যে গর্ভ আমাদের ধারণ করেছিল, তা কি হিমাগার ছিল?

নাকি আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত আমাদের পিতার রক্ত সাদা হয়ে গিয়েছে?

আমাদের রক্তের বারুদ কেন অগ্নিস্ফূলিঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে না?

আমাদের অন্তরে কেন প্রতিশোধের দাবানল সৃষ্টি হচ্ছে না?

আমরা কি অপেক্ষা করছি, কুকুর আর শুয়োরেরা আমাদের চোখের সামনে আমাদের মা, বোন আর স্ত্রী-কন্যাকে ধর্ষণ করবে, এরপর আমরা ময়দানে ঝাঁপ দিবো?

আমাদের সন্তানকে আমাদের চোখের সামনে কেটে টুকরা টুকরা করবে, এরপর আমরা ময়দানে যাবো?

আমাদের পিতা আর ভাইকে হায়েনাগুলো আগুনে পুড়িয়ে মারবে, এরপর আমরা ময়দানে দৌঁড় দিবো? (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

পৃথিবীর দেশে দেশে যে সকল মালাউন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আর ইহুদীরা আমাদের মা-বোন আর মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন ও ধর্ষণ করছে, নির্মমভাবে হত্যা করছে, এই মালাউন শয়তানদেরকে কি আমরা এমনি এমনি ছেড়ে দিবো? প্রতিশোধ নিবো না?

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ- إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح مسلم - 2586]

হযরত নু'মান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

'মুমিনদের পরস্পরের ভালোবাসা, অনুগ্রহ, হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার উদাহরণ হচ্ছে একটি দেহ বা শরীরের মতো। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন সারা দেহের সবগুলো অঙ্গই নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে এবং কষ্ট-যন্ত্রণায় জরাগ্রস্ত ও কাতর হয়ে পড়ে।' (সহীহ বুখারী -৬০১১, সহীহ মুসলিম- ২৫৮৬)

প্রিয় ভাই! তাই যদি হয়, বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত-নিপীড়িত, ধর্ষণ আর গণহত্যার শিকার মুসলমান মা-বোন আর শিশুদের জন্য আমাদের হৃদয়ে ব্যথার ঝড় কেন বইছে না? প্রতিশোধের আগুন কেন জ্বলছে না? আমরা কি তাহলে প্রকৃত মুমিন নই???

ফিলিস্তিনের মা-বোনেরা কি আমাদের মা-বোন নন? তাদের সন্তানেরা কি আমাদের সন্তান নয়?

ইরাক-সিরায়ার মা-বোনেরা কি আমাদের মা-বোন নন? তাদের সন্তানেরা কি আমাদের সন্তান নয়?

উইঘুরের মা-বোনেরা কি আমাদের মা-বোন নন? তাদের সন্তানেরা কি আমাদের সন্তান নয়?

কাশ্মীরের মা-বোনেরা কি আমাদের মা-বোন নন? তাদের সন্তানেরা কি আমাদের সন্তান নয়?

আরাকানের মা-বোনেরা কি আমাদের মা-বোন নন? তাদের সন্তানেরা কি আমাদের সন্তান নয়?...................

হায়! আমরা কিভাবে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি, কিভাবে আমোদ-প্রমোদ আর আরাম-আয়েশের মাঝে জীবন কাটাতে পারি, কিভাবে শান্তিতে ঘুমাতে পারি, যখন সেই সকল ভূমির মুসলমানরা বোমার নীচে ঘুমাচ্ছে, আহারের জন্য শত্রুর নিক্ষিপ্ত বোমা ছাড়া আর কিছুই তারা পাচ্ছে না? বোমার আঘাতে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে?

সেসকল অসহায়, মজলুম মুলমানদের জন্য আমাদের জীবন, আমাদের পিতা-মাতা আর স্ত্রী-সন্তানরা কুরবান হোক!............

হ্যাঁ ভাই, আমাদের হৃদয়ে কেন অনুশোচনার ঝড় বইছে না?

আমাদের অন্তর হতে কেন প্রতিশোধের লাভা উত্থিত হচ্ছে না?

আর কতদিন নারীত্বের মালা পরে ঘরে বসে থাকবো?

আর কতদিন হাতে চুড়ি, মাথায় ঘোমটা পরে অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে থাকবো?

কাপুরুষের যিন্দেগী ভাই আর কতদিন?

ইঁদুরের মতো হাজার বছর বাঁচার চেয়ে সিংহের মতো একদিন বাঁচা কি উত্তম নয়?..............

ওহে ভাই!

ওহে উম্মাহর অগ্নিপুরুষ!

ওহে যৌবনের অগ্নিস্ফূলিঙ্গ!

জেগে উঠুন!

জ্বালিয়ে দিন আপনার লেলিহান অগ্নিশিখা!

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক জিহাদের দাবানল!

পুড়িয়ে দিন বাতিলের সকল শিবির!...............

হায়! আমরা কি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি?

আরে শাহাদাত তো মৃত্যু নয়, চির জীবন! অনন্ত কাল বেঁচে থাকার নাম! তাতো জীবিত থাকার চেয়ে আরো উত্তম! আরো উত্তম!

চেয়ে দেখুন ভাই! কত মানুষ বাতিল ধর্ম ও মতবাদের জন্য, তাগুতের জন্য আপন জীবন দিয়ে দিচ্ছে। আমরা কি সত্যের অনুসারী হয়েও মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি?

আমরা কি সুউচ্চ জান্নাতের কথা ভুলে গিয়েছি? আমরা কি ভুলে গিয়েছি জান্নাতুল ফিরদাউসের কথা? যার ছাদ হবে রহমানের আরশ? যাতে রয়েছে আমাদের হাবীবের ﷺ প্রতিবেশ?

আমরা কি মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে যেতে চাইনা? জান্নাতী হূরের সাক্ষাৎ চাই না? আমরা কি হূরে ঈন, হূরে লূ'বা, হূরে মার্জিয়াদের কথা ভুলে গিয়েছি?

তাদের সাথে মিলনের আনন্দের কথা কি ভুলে গিয়েছি? তাদের ডাক কি আমরা শুনতে পাচ্ছি না?

চেয়ে দেখুন ভাই, মুসলিম ভূমিগুলোতে জান্নাতের বাজার এখন রমরমাট হয়ে উঠেছে? আল্লাহর বান্দারা দলে দলে জান্নাতের দিকে ছুটে যাচ্ছে, প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে!

সুবহানাল্লাহ, উত্তপ্ত ভূমিগুলোতে আজ জান্নাতী হূরদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে? তারা আসছে-যাচ্ছে, আসছে-যাচ্ছে; তারা আসছে জান্নাতী সবুজ রুমাল সাথে নিয়ে- আর জান্নাতুল ফিরদাউসে ফিরে যাচ্ছে তাদের প্রিয়তম স্বামীদেরকে, আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণকারী মুজাহিদদেরকে সাথে নিয়ে! কি ভাই, তাদের পদচারণা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না???

আহ! কী মনোমুগ্ধকর সেই দৃশ্য!!! আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না ভাই???

আমরা কি চাইনা সে সকল শহীদী কাফেলায় শরীক হতে? শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিতে? হূরে ঈ'নদের হাতে হাত রেখে সবুজ পাখি হয়ে জান্নাতে উড়ে যেতে?

প্রিয় প্রভু আল্লাহ তা'আলার দীদারের কথা কি আমরা ভুলে গিয়েছি? তার মহাসন্তুষ্টির কথা? তাঁর দীদার-সুখের সামনে অন্য কোনো সুখের তুলনা চলে কি?...........

তাহলে ভাই, কেন আর দেরী?...............

আর নয় ঘুম!

এবার জেগে উঠার পালা!

সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যাবার পালা!

কাঁধে কাঁধ রেখে মোকাবিলা করার পালা!

হাতে হাত রেখে প্রতিশোধ নেবার পালা!

এবার দেনা পরিশোধের পালা!

এবার রণসাজে সজ্জিত হয়ে মরুসিংহের ন্যায় গর্জে উঠার পালা!

এবার ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা!

এবার ক্রুসেডার খ্রিস্টান আর ইহুদীদের 'টমেটো আর গাজরের ন্যায়' টুকরা টুকরা করার পালা!

এবার হানাদার হিন্দুত্ববাদী আর বৌদ্ধদের 'আলু আর শসা'র ন্যায় চাক চাক করার পালা!

এবার নাস্তিক-মুরতাদদের যমের ঘরে চালান দেয়ার পালা!

এবার আল্লাহর দুশমনদের 'পাউডার' বানানোর পালা!....................

প্রিয় ভাই! যুদ্ধের দামামা বাজে ঐ, শিরে বাঁধুন আমামা!

জিহাদের আযান শুনুন, ডাকছে আপনাকে যামানা!

উচ্চ কণ্ঠে তুলুন তাকবীর, দিন তার জওয়াব!

জেগে উঠুন, ঝেড়ে ফেলে নিষ্ফল খোয়াব!

আপনার আওয়ায যেনো হয় ইসরাফিলের শিঙা!

আপনার তাকবীর আর রণহুংকারে বাতিলের শিবিরে শুরু হোক কিয়ামতের বিভীষিকা!

আপনাকে হতে হবে বাতিলের যম, আযরাঈলের থাবা!

আপনি যেন হন জীবরাঈলের বাহুবল, আগ্নেয়গিরির লাভা!

বাতিলের উপর আপনি পতিত হন যেন কালবৈশাখীর বজ্রপাত!

আপনাকে হতে হবে টর্নেডো, সাইক্লোন; হতে হবে গর্জিত অগ্নুৎপাত!..............

এবার মুসলমানদের প্রতিটি রক্ত-ফোটার প্রতিশোধ নেবার পালা,

প্রতিটি মা-বোনের হৃত ইজ্জত-সম্ভ্রমের বদলা নেবার পালা,

এক হাতে নিয়ে কুরআন, আরেক হাতে মেশিনগান,

এবার তাকবীরে তাকবীরে আসমান-যমীন প্রকম্পিত করার পালা,

"লিল্লাহি তাকবীর, আল্লাহু আকবার!

লিল্লাহি তাকবীর, আল্লাহু আকবার!

লিল্লাহি তাকবীর, আল্লাহু আকবার!".............

ওহে মুসলিম শিশু কিশোরের দল!

ওহে সিংহ শাবকের দল!

তোমরাই হলে আগামী দিনের তরূণ যুবক, মিল্লাতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক!

আজ হতে নাও তোমরা সামরিক প্রশিক্ষণ ।

রপ্ত কর যাবতীয় সমর কৌশল।

ট্যাংক ও অস্ত্রই হোক তোমাদের নিত্য দিনের খেলনা।

বিলাসবহুল জীবন নয়, তোমাদের প্রয়োজন কষ্টসহিষ্ণু মুক্ত-বিহঙ্গের জীবন।

এড়িয়ে চল ফুলশয্যা, বরণ কর কণ্টকপূর্ণ গৃহাঙ্গন।

সঙ্গীতের সুরের চেয়ে তরবারির ঝংকার হোক তোমার অধিক প্রিয়!

ছুড়ে দাও তুমি শত্রুর প্রতি চ্যালেঞ্জ, তোমার কিসের ভয়?

ইনশাআল্লাহ্, একদিন তোমার দ্বারাই সূচিত হবে মুসলিম মিল্লাতের ঐতিহাসিক বিজয়।

বজ্রনাদ!!!

(সারা দুনিয়ার আগ্রাসী কুফ্ফারদের প্রতি 'চরমপত্র')

ওহে বাতিল শক্তি!

ওহে আমেরিকা ও তার দালালেরা!

ওহে মুসলমানদের উপর তরবারি উত্তোলনকারী যত ক্রুসেডার সম্প্রদায়!

ওহে ইহুদী-খ্রিস্টান হায়েনার দল!

ওহে আগ্রাসী হিন্দু আর বৌদ্ধের দল!

ওহে নাস্তিক-মুরতাদ আর মুনাফিকের দলেরা!

ওহে দুনিয়ার যত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনেরা!

সময় থাকতে তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, কুরআনের প্রতি আর পরকালের প্রতি। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নাও। শয়তানের উপাসনা করো না, এক আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি তোমাদের ও আমাদের প্রতিপালক, আসমান-যমীন, তার মধ্যবর্তী ও তার বাহিরের সকল কিছুর প্রতিপালক এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যার উপাসনা কর তিনি তাদেরও প্রতিপালক।

না হয় জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবাদের জামাতের প্রকৃত অনুসারী এমন এক জামাত 'কালো পতাকার বাহিনী'কে প্রস্তুত করছেন, তোমাদেরকে সহ এই যামানার সমস্ত বাতিল শক্তিকে জিন্দা অথবা মুর্দা

দাফন করার জন্য, তোমাদের সমস্ত শক্তি মিলে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ্। কেননা আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের মাওলা, আমাদের অভিভাবক মহাপরাক্রমশালী, সবর্শক্তিমান আল্লাহ! কিন্তু তোমাদের কোন মাওলা নেই, নেই কোনো সাহায্যকারী!

ওহে মুসলিম মা-বোনের সম্ভ্রম নিয়ে ক্রীড়াকারী যত সম্প্রদায়! ওহে হানাদার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আর নাস্তিক-মুরতাদেরা!

ওহে নিকৃষ্ট জানোয়ারের দল! তোমাদের হায়েনাগিরির হায়াত বেশি দিন আর বাকী নেই, ইনশাআল্লাহ্। যত পার করতে থাক, শীঘ্রই তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া হবে ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায়, তখন তোমরা পালাবার জায়গা পাবে না। (ইনশাআল্লাহ)

ওহে ইসরাইল! ওহে আমেরিকার জারজ সন্তান! ওহে জায়নবাদী কুকুরের দল!

ওহে আল্লাহর লা'নতপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! কুকুরও তো তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট! বরং তোমাদের তুলনা তো কোনো পশুর সাথেও চলেনা!

ওহে মানবতার নিকৃষ্টতম দুশমন! ওহে নিকৃষ্টতম কুলাঙ্গারের দল! খুব শীঘ্রই তোমরা দেখতে পাবে, তোমাদের আয়রন ডোম, বোমা আর কামান-ট্যাংকের শক্তি আল্লাহর গযব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে কিনা!

আস তোমরা! সকলে ইসরাইলে জড়ো হও! তোমাদের প্রতীক্ষিত সময় খুব নিকটে, ইনশাআল্লাহ!

خيبر خيبر يا ياهود - جيش محمد سيعود

খাইবার খাইবার হে ইহুদীরা (খাইবারের স্মৃতি স্মরণ কর!)-
মুহাম্মাদের ﷺ বাহিনী আবারো শীঘ্রই ফিরে আসছে!

মদীনার মত ইসরাইল থেকে এবার তোমাদেরকে কেবল বিতাড়ন করা হবে না, ইসরাইলকে তোমাদের গোরস্তানে পরিণত করা হবে! (ইনশাআল্লাহ)

আল্লাহর ইচ্ছায়, আমরা আসছি তোমাদের ঘরে ঘরে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য, এমন ধ্বংসযজ্ঞ যা ইতিহাস কোনোদিন দেখেনি, ইতিহাস কোনোদিন শুনেনি, কোনো ঐতিহাসিক কোনোদিন কল্পনাও করেনি, যেই ধ্বংসযজ্ঞ চলবে যেখানেই তোমাদের পাওয়া হবে সেখানেই! (ইনশাআল্লাহ)

তোমাদের 'গ্রেটার ইসরাইল' গড়ার স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে আমরা আসছি! তোমরা অপেক্ষা কর "চূড়ান্ত হলোকস্ট" (Final Holocaust) দেখার জন্য, যেদিন তোমাদেরকে ভয়ঙ্কররূপে 'কঁচুকাটা' করা হবে। আর এটিই হবে ইহুদী প্রশ্নের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সমাধান। (ইনশাআল্লাহ)..........

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا- إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

"অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।" (সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৬-৭)

ওহে অভিশপ্ত জায়নিস্ট ইহুদী সম্প্রদায়! ওহে দাজ্জালের দক্ষিণ বাহু! তোমাদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী! আর শোনে রাখ, বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ আমাদেরই! কেননা প্রিয়নবী ﷺ এর সত্য বাণী বাস্তবায়িত হবেই, ইনশাআল্লাহ। তিনি ﷺ বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ . إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ "

"ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ না ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে ইহুদীদেরকে হত্যা করা হবে। কোনো ইহুদী পালিয়ে গাছ বা পাথরের পেছনে আত্মগোপন করলে সেই গাছ বা পাথর মুসলমানকে ডেকে বলতে থাকবে- ওহে মুসলিম! ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে, এদিকে এসো! একে হত্যা কর। তবে গারকাদ বৃক্ষ একথা বলবে না। কারণ, সে ইহুদীদের বৃক্ষ।" (মুসলিম)

একটু চিন্তা কর্! তোমরা কতটুকু অভিশপ্ত! তোমরা সৃষ্টি জগতের মধ্যে কতটুকু ঘৃণিত! তোমরা সৃষ্টিজগতের সকলের অভিশাপে অভিশপ্ত! সেদিন গাছ-পাথরও তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, যেদিন আমরা তোমাদেরকে চূড়ান্ত পাকড়াও করবো! (ইনশাআল্লাহ)

ইসরাইলে ইহুদী কর্তৃক রোপিত সারি সারি গারকাদ বৃক্ষ।

হ্যাঁ, তোমরা বেশি বেশি গারকাদ বৃক্ষ রোপন করতে থাক্! আমরা আসছি তোমাদের গারকাদসহ তোমাদেরকে শামের ভূমিতে জীবন্ত কিংবা মৃত পুতে ফেলতে! সুতরাং আরেকটু অপেক্ষা কর, ওহে হারামী সম্প্রদায়.......................!!!

ওহে ক্রুসেডার খ্রিস্টান সম্প্রদায়! ওহে আমেরিকা-ইংল্যান্ড-রাশিয়ার সহচরের দল!

খুব শীঘ্রই তোমাদের দম্ভকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে! (ইনশাআল্লাহ)

তোমাদের শয়তানীর হিসেব কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করা হবে। (ইনশাআল্লাহ)

তোমরা তো সেই পাপী সম্প্রদায়, যারা মদ ও কামরিপুর দাস!

তোমরাই তো সেই জাতি, যারা নিজেদের মা ও মেয়েদের সাথে হারাম সম্পর্ককেও হালাল করে নিয়েছ!

তোমরাই তো সেই জাতি যারা সমকামিতার বৈধতা প্রদানকারী..............

শুনে রাখ-

মিশনের নামে মুসলিম ভূমিতে স্কুল, কলেজ আর হাসপাতালের জন্য জমি ক্রয় না করে গোরস্তানের জায়গা কিনতে থাক! কেননা, খুব শীঘ্রই তোমাদের লাশের বহর আসছে! (ইনশাআল্লাহ)

আমার হৃদয়পটে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি- তোমাদের লাশগুলো কবরে জায়গা না পেয়ে শকুন আর কুকুরের খাদ্যে পরিণত হয়েছে!

তোমাদের নেতাদের বিগলিত হাড্ডিগুলো কুকুর আর শূকরেরা মজা করে ভক্ষণ করছে!

ইনশাআল্লাহ, তোমাদের সাথে দেখা হবে **জেরুজালেমে, পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 'মালহামাতুল কুবরা'র (মহাযুদ্ধের) ময়দানে**। যেটি হবে পৃথিবীর শেষ মহাযুদ্ধ, হক-বাতিলের সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ। এরপর শুধু বিজয়ী ধর্ম ইসলাম বাকী থাকবে, দুনিয়াব্যাপী শরীয়াহর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, খিলাফাহ্ 'আলা মিনহাজিন্নুবুয়্যাহ' প্রতিষ্ঠিত হবে। (ইনশাআল্লাহ)

ইনশাআল্লাহ, এ যুদ্ধে তোমাদের লাশে যমীন ভরে যাবে, আসমান-যমীন বিষাক্ত হয়ে যাবে.............

ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভূমিতে কেবল লাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। এমনকি একটি পাখি ধ্বংসযজ্ঞের এক প্রান্ত হতে উড়া শুরু করলে শেষ প্রান্তে পৌঁছার আগেই পাখিটি মারা যাবে। যে যুদ্ধের কেন্দ্রভূমি হবে শাম। (ইনশাআল্লাহ) আমরা আসছি শামে............... অপেক্ষায় থাক.............

ওহে আগ্রাসী মালাউন হিন্দুত্ববাদীদের দল!

তোমাদের বর্বরতা আর নির্যাতনের ফিরিস্তি আমরা ভুলে যাইনি............

মুসলিম মা-বোনের উপর তোমাদের অত্যাচার আর সম্ভ্রমহানি- আমরা কখনো ভুলে যেতে পারি না............

ওহে নাপাক গোমূত্র পানকারীর দল! শুনে রাখ-

ইনশাআল্লাহ, মুসলমানের প্রতিটি রক্তফোটার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে...........

মা-বোনের প্রতিটি আর্তনাদ ও সম্ভ্রমের মূল্য তোমাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে.........

তাই, তোমাদের শ্মশানগুলোকে প্রশস্ত করতে থাক, চিতার সংখ্যা বাড়াতে থাক!

তোমাদের শ্মশানঘাটগুলোকে 'মহাশ্মশানে' রূপান্তরিত করা হবে। তোমাদের শবদাহে পরিবেশ দূষিত হয়ে যাবে! (ইনশাআল্লাহ)

তোমাদের লাশের স্থান শ্মশানেও হবে না!

আমার কল্পলোকে যেন দেখতে পাচ্ছি- তোমাদের শবদাহ আর লাশের দূর্গন্ধে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে, তোমরা পোকা-মাকড়ের আহার্যে পরিণত হয়েছ!

ইনশাআল্লাহ, তোমাদের সাথে মোকাবেলা হবে গায্ওয়াতুল হিন্দে। একজন মুসলমান জীবিত থাকা পর্যন্ত তোমাদেরকে শান্তিতে ঘুমাতে দেয়া হবে না।

তোমাদের চূড়ান্ত পতন না হওয়া অবধি এ যুদ্ধ বন্ধ হবে না..............

দিল্লীর লালকেল্লায় কালেমার পতাকা উড্ডীন না হওয়া পর্যন্ত এ জিহাদ বন্ধ হবে না......... (ইনশাআল্লাহু আয্যা ওয়া জাল্)

তোমরা প্রস্তুত থাক্ আমাদের কুরবানীর পশু হওয়ার জন্য......................

ইনশাআল্লাহ, তোমাদের সীমালঙ্ঘনের দিন ফুরিয়ে এসেছে, ওহে নাপাক, পৌত্তলিক সম্প্রদায়.........

খুব ভালো করে শুনে রাখ!

ইনশাআল্লাহ, শীঘ্রই তোমাদের জাহান্নামে পাঠানোর পয়গাম আসছে............

ইনশাআল্লাহ, তোমাদের **রামরাজত্ব আর 'অখণ্ড ভারতে'**র স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে আমরা আসছি......

ইনশাআল্লাহ, কাশ্মীরকে তোমাদের শ্মশানঘাটে পরিণত করা হবে........ যে কোনো মূল্যে কাশ্মীরকে আজাদ করা হবে.........

ডাক তোমাদের সহযোগীদের, তোমাদের সকল উপাস্যদের, দেখ তারা এক আল্লাহর সামনে টিকতে পারে কিনা! তোমাদের পারমানবিক অস্ত্রগুলো তোমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় কিনা!.....................

ওহে আগ্রাসী মালাউন বৌদ্ধ সম্প্রদায়! ওহে ন্যাড়া কুত্তার দল!

আরাকানে রোহিঙ্গা ভাই-বোনদের সাথে তোমাদের আচরণ আমরা ভুলে যাইনি.........

ধর্ষিতা বোনের চিৎকারের আওয়াজ এখনো বাতাসে মিলিয়ে যায়নি..........

জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা মুসলিমদের আর্তনাদ ও মৃত্যুযন্ত্রনা আমরা বিস্মৃত হইনি........

জীবন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে দেয়ার দৃশ্য হতে আমাদের দৃষ্টি এখনো সরে যায়নি........

ওরে হারামীর বাচ্চারা! ওরে ন্যাড়া হায়েনার দল!

ইনশাআল্লাহ, এবার তোমাদের চামড়া খসিয়ে দেয়া হবে............

তোমাদেরকে মর্মান্তিক মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করানো হবে........... (ইনশাআল্লাহ)

তরবারি তোমাদের মাথার উপর চলে এসেছে, একটু মাথা উঁচু করে দেখ, ওহে খোদার শত্রুদল! আল্লাহর গযব আস্বাদনের জন্য প্রস্তুত হও!

আযরাঈলের পায়ের আওয়াজ যেন পাওয়া যায়...........

ওহে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শানে কটুক্তিকারী মালাউন নাস্তিক সম্প্রদায়!

ওহে জারজ সম্প্রদায়! ওহে সমকামী সম্প্রদায়!

ওহে সৃষ্টির নিকৃষ্ট কুলাঙ্গারেরা!

তোমরা যেই আল্লাহকে অস্বীকার করে থাক, সেই আল্লাহর ফরমান চলে এসেছে।

ইনশাআল্লাহ, তোমাদেরকে কুরবানির গরু বানানো হবে। রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে জবাই করা হবে। তোমাদের মস্তকগুলোকে কেটে রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রদর্শনী করা হবে। তোমাদের কর্তিত মস্তকে 'পিরামিড' বানানো হবে! (ইনশাআল্লাহ)

আল্লাহর দুনিয়াতে থাকার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। এমন কেউ আছে কি তোমাদেরকে আল্লাহর রোষানল থেকে রক্ষা করবে?

সুতরাং প্রস্তুত হও!................

ওহে মুসলিম দেশের মুনাফিক ও মুরতাদ শাসক গোষ্ঠী!

আল্লাহর বিধানের বিপরীতে নিজেদের মনগড়া আইন প্রণয়নের কারণে তোমরা মুরতাদ সাব্যস্ত হয়েছ।

তোমরাই তো মুসলমানদের উপর 'গণতন্ত্র' নামক কুফুরী ও শিরকী ধর্ম চাপিয়ে দিয়েছ।

তোমরাই তো নেককার ও খাঁটি মুসলমানদের টুটি চেপে ধরেছ। অন্যদিকে নগ্নতা, বেহায়াপনা, অধর্ম ও ধর্মহীনতাকে প্রমোট করছ।

মুসলমানদের ঈমান আমল ধ্বংস করছ। মুসলমানদের ধন-সম্পদকে তোমাদের পশ্চিমা প্রভুদের দেশে পাচার করে দিচ্ছ।

পশ্চিমা প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে তোমরাই তো মুজাহিদদের সাথে দুশমনী করছ। রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে বাঁধা দিচ্ছ। দেশের সীমানাগুলোকে সীল করে দিয়েছ।

তোমরাই তো এক উম্মাহকে শতধাবিভক্ত করে রেখেছ। জাতীয়তাবাদের সবক শিখাচ্ছ। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে এক উম্মাহকে সাতান্ন ভাগ করেছ।

সময় থাকতে তোমরা আমেরিকা-রাশিয়া আর তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের পা-চাটা বন্ধ কর।

ইহুদী-নাসারা আর মালাউন হিন্দুত্ববাদীদের গোলামী বন্ধ কর। তাদের সাথে বন্ধুত্বের নীতি পরিহার কর।

তাদের প্রদত্ত এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা বন্ধ কর।

নতুবা, দেশে দেশে মুসলমানদের মাঝে যে জিহাদী জাগরণের সূচনা হয়েছে, তা তোমাদের মসনদকে গুড়িয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ। তোমরা পালাবার সময় পাবে না ইনশাআল্লাহ।

বৈশ্বিক জিহাদের আগুনে জ্বলে-পুড়ে তোমরা ছারখার হয়ে যাবে, যেমনভাবে হয়েছে আফগানিস্তানের পুতুল সরকার!!

জেনে রাখ! নিষ্ঠাবান মুজাহিদরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছেন। জিহাদের এ আগুন তোমাদেরকে অবশ্যই স্পর্শ করবে, খুব শীঘ্রই স্পর্শ করবে ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং, অপেক্ষায় থাক.................

ওহে দুনিয়ার তাবৎ তাগুত ও বাতিল সম্প্রদায়!

ওহে পাপিষ্ঠের দলেরা!

তোমরা আল্লাহর কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছ।

তোমরা তো সেই সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে থাক, তাকে অস্বীকার কর, আল্লাহর পবিত্রতাকে অপছন্দ কর, যারা আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়া থেকে বিদায় জানাতে চাও, মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে নিঃশ্চিহ্ন করে দিতে চাও।

তোমরাই তো সেই সম্প্রদায় যারা আল্লাহ তা'আলার বিধানগুলোর তোয়াক্কা কর না, উপরন্তু চরম সীমালঙ্ঘন করে থাক।

সকলেই শুনে রাখ!

খুব শীঘ্রই পৃথিবীতে তোমাদের যমদূতের আবির্ভাব ঘটবে, তোমাদের আযরাঈলের আত্মপ্রকাশ খুব নিকটবর্তী। (ইনশাআল্লাহ)

তোমাদের রাজ্যগুলোতে টর্নেডো আর সাইক্লোন চালানো হবে, মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা শুরু করা হবে, তোমাদেরকে টমেটো আর মূলার মতো কাটা হবে, তোমাদের নারীদেরকে দাসী-বাঁদী বানানো হবে! (ইনশাআল্লাহ)

হয়তো তোমরা আল্লাহর বিধান মেনে জান্নাতের পথে আসবে, নয়তো তোমাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। (ইনশাআল্লাহ)

খুব শীঘ্রই তোমাদের পরিণতি তোমরা দেখতে পারবে!

প্রতিশ্রুত সেই সময় ইনশাআল্লাহ খুবই নিকটে!.............

ইনশাআল্লাহ, আমরা আসছি.......

তোমাদের সকল পাওনা মিটিয়ে দেয়ার জন্য আমরা খুব শীঘ্রই আসছি..........

শুনে রাখ-

আমরা তো সেই যোদ্ধা,

যারা বাতিলের গোশতকে জন্তু জানোয়ারের আহার্যে পরিণত করি..........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, তাগুতের রক্ত প্রবাহিত করে যারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ি..........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, ঘুম যাদের চক্ষুকে ক্লান্ত করে না, কিন্তু কুফ্ফারদের ঘুমকে হারাম করে রাখি..........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা অনর্থক কথা বলে না, কিন্তু রণহুঙ্কারে আসমান যমীন প্রকম্পিত করি........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা ক্রীড়া-কৌতুক করি না, তবে দুশমনের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে তাকবীর ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করি.......

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা তোমাদের সর্বনাশ ঘটিয়ে অন্তরকে প্রশান্ত করি...........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা মৃত্যুকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি যতটুকু তোমরা বেঁচে থাকতে ভালোবাস........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা শাহাদাতকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি যতটুকু তোমরা মদ আর নারীকে ভালোবাস........

যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে......... আমাদেরকে যদি এখনো চিনে না থাক......... তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখ, আমরা কারা??

কারা তারা, যারা মাত্র তেইশ বছরে অর্ধপৃথিবী জয় করেছিল?

কারা কিসরা-কায়সারের গর্বিত মস্তককে ভূপাতিত করেছিল?

কারা রোম-পারস্যের অহংকারী মুকুটকে পদদলিত করেছিল?

কারা উদ্ধত তাতারীদের কঁচু-কাটা করেছিল?

তারা কারা, যারা মাত্র তিন দশকের ব্যবধানে রাশিয়া আর আমেরিকার মত সুপার পাওয়ারকে লজ্জাজনক পরাজয়ের গ্লানি আস্বাদন করিয়েছে?

হ্যাঁ, আমরাই তারা, তারাই হলাম আমরা ....

আমরা একই জাতি.......

একই যোদ্ধা..........

আমরা একই মায়ের সন্তান................

আমাদের সাথে মোকাবেলার জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রস্তুত থাক.........

ইনশাআল্লাহ! আমরা আসছি.........

ভালো করে জেনে রাখ- আমরাই সেই যোদ্ধা যারা শেষ পরিণামে অবশ্যই সফল ও বিজয়ী হবো। (ইনশাআল্লাহ) কেননা, এই ওয়াদা আমাদের মহাশক্তিশালী ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ আমাদের সাথে করেছেন, এবং যুগে যুগে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন।

هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনি তাঁর রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর বিজয়ী করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা সফ ৬১:৯)

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"আল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:২১)

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ

"এটা এজন্যে যে, আল্লাহ মুমিনদের হিতৈষী বন্ধু এবং কাফেরদের কোন হিতৈষী বন্ধু নেই।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১১)

সুতরাং তোমরা সকলেই মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও!

ইনশাআল্লাহ, তোমাদের সাথে মোকাবেলা হবে খুব শীঘ্রই.....

তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও তোমাদের সাথে সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম।...........

ওহে তারিক বিন যিয়াদ আর ইউসুফ বিন তাশফীনের বোনেরা!

এবার খুশি হয়ে যাও। কান্নার মাতম বন্ধ কর।

এবার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আর ইহুদিদের বসতিগুলোতে মাতম শুরু হওয়ার পালা।

তাই, বুকে পাথর বেঁধে, তোমাদের ভাই আর স্বামীদেরকে ময়দানে পাঠিয়ে দাও। তাদের বিচ্ছেদে সবর কর!

আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন, তিনিই তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের হেফাযত করবেন। তিনিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। সুউচ্চ জান্নাতে তোমাদেরকে আবার একত্রিত করবেন। (ইনশাআল্লাহ)

সেদিন খুব দূরে নয়!..............

ওহে মুহাম্মাদ বিন কাসিম আর মুহাম্মাদ আল ফাতিহ'র মায়েরা!

এবার আপনি নিজের সন্তানকে সবর্শেষ ও চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য সাজিয়ে তুলুন। কেননা, বরযাত্রীর লোকেরা এখন দিল্লী আর বাইতুল মুকাদ্দাস রওয়ানা হতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সকল বাদশাহর বাদশাহীর খতম হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

এক আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের সময় চলে এসেছে।

সুতরাং সময় এখন আমাদের, তাদের নয়।

এখন চিন্তামগ্নতা নয়, আল্লাহর ওয়াদার উপর ভরসা থাকা চাই!

এখন সময় আনন্দের, হতাশার নয়।

চেহারায় উদাসীনতা নয়, বরং উৎফুল্লতা থাকা চাই।

চোখ মুছে ফেলুন। দু'চোখে অশ্রু নয়, এখন বিজয়ের চমক থাকা চাই......

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ۝٣٢ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۝٣٣

"৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূর (ইসলাম)-কে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। ৩৩. তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (০৯ সূরা তাওবা:৩২-৩৩)

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ۝٢١

"আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, আমি (আল্লাহ) এবং আমার রাসূলগণ (ও তাঁদের অনুসারীরা) অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" (৫৮ মুজাদালাহ: ২১)

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ۝٥٦

"আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (তারাই আল্লাহর দল), আর নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।" (০৫ সূরা মায়েদাহ: ৫৬)

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

"এ দল তো (কাফেররা) সত্ত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।" (সূরা ক্বমার 54:45)

نَصۡرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٌ قَرِيبٌۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿١٣﴾

"(শীঘ্রই আসছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।"
(৬১ সূরা ছফ: ১৩)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব (খিলাফত/রাজত্ব/শাসনক্ষমতা) দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক (পাপিষ্ঠ)।" (সূরা নূর ২৪: ৫৫)

قَٰتِلُوهُمۡ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَيۡدِيكُمۡ وَيُخۡزِهِمۡ وَيَنصُرۡكُمۡ عَلَيۡهِمۡ وَيَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمٖ مُّؤۡمِنِينَ ١٤

"যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দিবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।

(০৯ সূরা আত্-তাওবাহ: ১৪)

দুআ

(কুনুতে নাযেলা)

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ- وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ- وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ- وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا أَعْطَيْتَ- وَقِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ- إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ- إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ- وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ -تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন, তাদের মাঝে যাদেরকে আপনি হেদায়াত দান করেছেন। আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন, তাদের মাঝে যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন। আমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করুন, তাদের মাঝে যাদের দায়িত্বভার আপনি গ্রহণ করেছেন। আপনি আমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেছেন, তাতে বারাকাহ দিন। আমাদেরকে রক্ষা করুন, আপনার মন্দ ফায়সালা থেকে এবং আমাদের থেকে তা দূরে সরিয়ে দিন । নিশ্চয়ই আপনি ফায়সালা করেন, আপনার উপর কেউ ফায়সালা করতে পারে না। আপনি যার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে না। আপনি যার সাথে শত্রুতা করেন, তাকে কেউ ইজ্জত দিতে পারে না। আপনি বরকতময় এবং সুমহান, হে আমাদের প্রতিপালক।" (সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি)

نَسْتَغْفِرُكَ اللّٰهُمَّ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ -اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ- وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ- وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ- وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ.

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তওবা করছি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে এবং ঈমানদার নর-নারী ও মুসলিম নর-নারীদেরকে ক্ষমা করুন। আর তাদের অন্তরগুলোকে 'এক' করে দিন। এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।

اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَائَكَ -اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَدَمِّرْ دِيَارَهُمْ وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَمَزِّقْ جَمْعَهُمْ- اَللّٰهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ-

হে আল্লাহ, অভিশাপ দিন সেসকল কাফেরদের যারা আপনার পথ থেকে বাধা দেয়, আপনার রাসূলদের অস্বীকার করে এবং আপনার বন্ধুদের হত্যা করে/তাদের সাথে যুদ্ধ করে। হে আল্লাহ, তাদের কথার বিরোধিতা করুন, তাদের পাগুলো প্রকম্পিত করুন, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করুন, তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিন এবং তাদের ঐক্য বিনষ্ট করে দিন। হে আল্লাহ, তাদের উপর আপনার শাস্তি নাযিল করুন, যা আপনি অপরাধীদের থেকে টলাবেন না।

اَللّٰهُمَّ خُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ- اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِمْ جُنُوْدًا لَّمْ يَرَوْهَا- اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ- اَللّٰهُمَّ أَهْلِكْهُمْ كَمَا أَهْلَكْتَ عَادًا وَّثَمُوْدًا- اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ

হে আল্লাহ! মহাপরাক্রমশালী ও মহাশক্তিশালীরূপে তাদের পাকড়াও করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের বিরুদ্ধে এমন বাহিনী প্রেরণ করুন যা তারা দেখতে পাবে না। হে আল্লাহ, আমরা আপনাকে তাদের মোকাবিলাকারী বানিয়েছি এবং তাদের অনিষ্ট

থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি তাদের ধ্বংস করে দিন, যেভাবে আপনি আদ ও সামুদ জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের প্রতি প্রলয়ঙ্করী বন্যা প্রেরণ করুন।

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

“হে আল্লাহ, কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্য দলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফের সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।” (সহীহ বুখারী: ৩০২৪, সহীহ মুসলিম: ১৭৪২)

اللَّهُمَّ وَفِّقْنا لِما تُحِبُّ وَتَرْضَى وَخُذْ مِنْ دِمائِنا حَتَّى تَرْضَى . اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا . اللَّهُمَّ إِنَّا وَنَسْئَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ وَنَسْئَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ وَنَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبادَتِكَ. اَللّهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَّصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ

“হে আল্লাহ, আপনি আমাদের এমন কাজে তাওফীক দান করুন, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে। এবং আপনার সন্তুষ্টির পথে আমাদের রক্তগুলোকে কবুল করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য নেয়ামতকে বাড়িয়ে দিন, কমিয়ে দিবেন না। আমাদের সম্মানিত করুন, লাঞ্ছিত করবেন না। আমাদেরকে দান করুন, বঞ্চিত করবেন না। আমাদেরকে বিজয় দান করুন, আমাদের উপর কাউকে কর্তৃত্ব দিবেন না। আমাদেরকে সন্তুষ্ট করুন, আমাদের উপর আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে সকল ক্ষেত্রে দৃঢ়তা এবং সঠিক পথের অবিচলতা কামনা করি। আর আমরা আপনার কাছে তাওফীক চাই- নেয়ামতের শোকর আদায়ের, উত্তম ইবাদাতের। হে আল্লাহ, আপনি সাহায্য করুন, যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনকে সাহায্য করবে; আর আমাদেরও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি লাঞ্ছিত করুন, যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনকে লাঞ্ছিত করবে; আপনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

اَللّٰهُمَّ احْفَظِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ كُلِّ بِلَادٍ- اَللّٰهُمَّ انْصُرِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ- وَصَلَّى الله تَعَالىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَّاٰلِه وَأَصْحَابِه أَجْمَعِيْنَ- وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - آمين يا رب العالمين!

হে আল্লাহ! সকল দেশের মুসলমানদেরকে আপনি হেফাজত করুন। হে আল্লাহ, মুজাহিদীনদের সর্বত্র সাহায্য ও বিজয় দান করুন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক তাঁর সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সমস্ত সাহাবীদের উপর। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তার জন্য। হে বিশ্বজগতের পালনকর্তা! আপনি আমাদের দুআগুলোকে কবুল করুন।

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ❖ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

মুহাম্মদের সা. হাতে করেছি শপথ জিহাদের,

পিছু হটবনা কভূ পূর্বে মউতের ।

****

মুহতারাম মুস'আব ইলদিরিম ভাইয়ের লিখিত অন্যান্য কিতাবের লিংক:

"কিতাবুত তাহরীদ" (পূর্ববর্তী পর্বগুলো) পড়ুন নিচের লিংকে (অবশ্যই Tor Browser ব্যবহার করুন)

পর্ব-১: আগ্নেয়গিরি হতে অগ্নুৎপাত:

'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্' ফোরাম পোস্ট লিংক-https://bit.ly/tahrid1

পিডিএফ লিংক: https://archive.org/details/kitabuttahrid1

....

পর্ব 0২: তাওহীদ ও জিহাদ

'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্' ফোরাম পোস্ট লিংক- https://bit.ly/tahrid২

পিডিএফ লিংক: https://archive.org/details/kitabuttahrid২

....

পর্ব ০৩: ভালোবাসি তোমায় হে জিহাদ!

'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্' ফোরাম পোস্ট লিংক- https://bit.ly/tahrid3

পিডিএফ লিংক: https://archive.org/details/tahrid3

....

পর্ব ০৪: "তোমাকেই শুধু চাই, হে শাহাদাত!

'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্' ফোরাম পোস্ট লিংক- https://bit.ly/tahrid4

পিডিএফ লিংক: https://bit.ly/kt4pdf

....

পর্ব ০৫: "আর কতকাল আমরা নিজেদেরকে এমনিভাবে ধোঁকা দিব?"

'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্' ফোরাম পোস্ট লিংক- https://bit.ly/tahrid5

পিডিএফ লিংক: https://bit.ly/kt5pdf

****

****

ইসলামের সোনালি অতীত, উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যত বিজয়গাঁথা নিয়ে **মুস'আব ইলদিরিম** ভাইয়ের লিখিত একটি অনবদ্য কিতাব-

"কালজয়ী ইসলাম"

দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ পোস্ট লিংক: https://bit.ly/kaljoyi-islam

পিডিএফ লিংক: https://bit.ly/kaljoie-islam

****

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

কিতাবুত্ তাহরীদ্ ‘আলাল ক্বিতাল

মুস‘আব ইলদিরিম